প্রবাহ

দ্বিতীয় বর্ষ | ২০২১

নরসিংহ দত্ত কলেজ

১২৯, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

প্রবাহ

দ্বিতীয় বর্ষ | ২০২১

নরসিংহ দত্ত কলেজ

১২৯, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

ফোন ঃ +৯১৩৩২৬৪৩৮০৪৯, ফ্যাক্স ঃ +৯১৩৩২৬৪৩৪২৫৯

Email: principal@narasinhaduttcollege.edu.in

প্রবাহ (PRABAHA)
বার্ষিক কলেজ পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২১

সম্পাদক :
ড: সোমা বন্দোপাধ্যায়
অধ্যক্ষা, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

উপদেষ্টামণ্ডলী :
ড: কুন্তল চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার সাহা
অধ্যাপক বর্ণালী ঘোষদস্তিদার
ড: অমল সরকার
অধ্যাপক সিদ্ধার্থ সেন
ড: শ্রুতি লাহিড়ী
অধ্যাপক মৌমিতা ধর (দে)
ড: কাকলি বিশ্বাস (বসাক)
ড: শম্পা সরকার
ড: প্রদীপ কুমার তপস্বী
অধ্যাপক মীনাক্ষি প্রামাণিক
ড: নীলাদ্রি দে
অধ্যাপক শুভাশীষ চট্টোপাধ্যায়
শ্রী মিঠুন হাজরা

প্রচ্ছদ ভাবনায় :
ড: শম্পা সরকার
অধ্যাপক, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

প্রকাশক :
ড: সোমা বন্দোপাধ্যায়
অধ্যক্ষা, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

অলংকরণ:
ফাইন ডট্স, কলকাতা ৩১
Email: finedots15@gmail.com

নাহি নাহি দৈন্য লেশ....

অতিমারির নাগপাশে সারা পৃথিবী যখন শ্বাসরুদ্ধ, সমগ্র মানবসভ্যতা যখন চার দেওয়ালের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে নিখিলবিশ্বকে, ঠিক তখনই চলার পথে পা বাড়িয়েছিল ‘‘প্রবাহ’’। নরসিংহ দত্ত কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষাসহায়ক বন্ধু সকলের সৃজনশীল মন গতি পেয়েছিল প্রবল উচ্ছ্বাসে ছুটে চলা ঝর্ণাধারার মতো। অতিমারির দাপট কিছুটা নিম্নগতির হলেও জীবনের প্রবাহ এখনো অনেকটাই রুদ্ধগতি। স্বজন হারানোর শোক বহু মানুষের জীবনপ্রবাহের গতি বদলে দিয়েছে অনেকটাই। এত কিছুর মধ্যেও গতি হারায়নি নরসিংহ দত্ত কলেজ পরিবারের সদস্যদের সৃজনপ্রবাহ। প্রকাশ পেতে চলেছে তার দ্বিতীয় সংখ্যা।

এই সংখ্যা সাজানো হয়েছে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, শিক্ষাসহায়ক বন্ধু সকলের সৃষ্টিসত্তার অলংকারে। অধ্যাপকের কলমে ফুটে উঠেছে - এক মায়ের গল্প। ছাত্রছাত্রীদের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে জীবনের বিভিন্ন আঙ্গিক, কিছু গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়। কখনও খেলার জগতে মানবমনের বিচরণ, কখনও দারিদ্র্য, কখনও বা আত্মপ্রত্যয়ের ঝলক। শিল্পীমনের অব্যক্ত ভাষা প্রাণ পেয়েছে তুলির আঁচড়ে। সৃষ্টিসুখের উল্লাসে বেজে উঠেছে ‘‘প্রবাহ’’-এর সপ্তসুরের জলতরঙ্গ।

‘‘প্রবাহ’’-এর আর এক বাঁকে বেজে উঠেছে বিষাদের সুর। ভারাক্রান্ত মনে পরিবারের একাধিক পরিজন স্মৃতিতর্পণ করেছেন এক পরমাত্মীয়ের যিনি এই প্রতিষ্ঠানের সূচনাপর্ব থেকে বিভিন্ন ভাবে এর সঙ্গে জড়িয়েছিলেন। স্মৃতিতর্পণের বিভিন্ন অধ্যায়ে কখনও তিনি স্নেহশীল পিতা, কখনও স্বপ্নের সওদাগর, কখনও অনুজপ্রতিম সহকর্মী, বিদায় না জানাতে পারার মতো অগ্রজ, কখনও অন্তরঙ্গ বন্ধু, কখনও বা দুর্বার গতিতে ছুটে চলা নীল রঙের ঘোড়া।

‘‘প্রবাহ’’-এর এক পর্বে বেজে উঠেছে ভস্মশয্যার থেকে জেগে-ওঠা মৃত্যুঞ্জয়ী সাধকের রুদ্রবীণা, অন্য পর্বে করুণ সুরের বাঁশির মূর্ছনা। দুই পর্বের মেলবন্ধনে পাঠকমনে জেগে উঠুক এই অনুভব —

‘কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে’

সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যক্ষা, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

অধ্যাপক সবুজ সেন স্মরণে

নরসিংহ দত্ত কলেজের অন্যতম রূপকার অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র সবুজ সেন ১৯৭০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় নৃবিজ্ঞান বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। প্রায় চার দশক ধরে অধ্যাপক সবুজ সেন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পাশাপাশি এই কলেজের নৃবিজ্ঞান বিভাগে কৃতবিদ্য শিক্ষকরূপে কর্মরত থেকে ২০০৭ সালে অবসর নেন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে কলেজের দিবা বিভাগের উপাধ্যক্ষ এবং ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল-এর কো-অর্ডিনেটর হিসাবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে তাঁর ভূমিকাও ছিল বিশেষ স্মরণযোগ্য। অবসরের পরেও কলেজের নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল এবং তিনি যুক্ত ছিলেন শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপনীত এই কলেজের ইতিহাস রচনার কাজে।

গত ৯ মে ২০২১ আমাদের সকলের প্রিয় অধ্যাপক সবুজ সেন কোভিডে আক্রান্ত হয়ে অকস্মাৎ চিরবিদায় নিয়েছেন, তাঁর চিন্তন ও লিখনের দায়বদ্ধ ব্রতযাত্রা অসমাপ্ত রেখে। প্রয়াত অধ্যাপক সবুজ সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ‘প্রবাহ’ পত্রিকার এই বাৎসরিক সংখ্যাটি তাঁর স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করা হল।

সূচিপত্র

আমার বাবা ৭
অমৃতা ব্যানার্জী

সবুজ সেন: স্মার্ট অ্যান্ড শার্প ১১
দীপক মুখার্জী

সহকর্মী সবুজ সেন ১৩
সন্ধি কুমার বেরা

হে বন্ধু বিদায় ১৪
পার্থ সেন

অধ্যাপক সবুজ সেন: একটি নীল রঙের ঘোড়া ১৬
মানস চৌধুরী

আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি না সবুজদা ২৩
কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

আমাদের সবুজদা ২৫
রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সবুজ স্বপ্নের সওদাগর ২৭
বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার

সবুজদা ৩০
সিদ্ধার্থ সেন

প্রকৃতি ৩২
প্রীতি মান্না

ভ্রমণপিয়াসী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৩
ঋতুবৃত্তা দত্ত

পৃথিবী-যুদ্ধ-মানুষ ৩৫
রৌণক বসু

বন্ধুর ঠিকানায় ৩৫
বুদ্ধদেব বর

তোমায় খুঁজি ৩৫
তিয়াসা সেনাপতি

নির্বাণের পথে অনির্বাণ ৩৬
অনির্বাণ দলুই

হেডফোন ৩৭
সায়ন কুন্ডু

বিষের ছায়া ৩৮
শুভঙ্কর দত্ত

অচেনা পৃথিবী ৩৮
তিয়াসা গোলুই

মাতলির রথ ও অজাতশত্রু ৩৯
রক্তিম ভট্টাচার্য

শিক্ষা ৪২
মৌসুমী মিত্র

নতুন নববর্ষ ৪৩
অনিন্দিতা জাশু

পাশের বাড়িটা পুলুদের ৪৬
অনির্বাণ রায়

পার্ফেক্ট ক্রাইম ৪৯
শুভজিৎ চ্যাটার্জী

কাশফুলের গন্ধ ৫৪
দেবকান্ত মাজী

করোনা সৃজন ৫৫
সঙ্গম গায়েন

প্রকৃত সরস্বতী ৫৬
অন্বেষা সুলতানা

উড়ান ৫৭
সোমজিৎ দে

এক মায়ের গল্প ৫৯
কৃষ্ণা ব্যানার্জী

Sports and Personality ৭১
Soma Bank

My Life will not be Worthless ৭২
Debanjana Banerjee

Love ৭২
Sourav Ghosh

My starving Soul ৭৩
Mithun Hazra

A Message To Death ৭৩
Aditi Sarkar

Out of the Windowpane ৭৪
Sayentani Chatterjee

Life ৭৪
Mahajabeen Anjum

Being a Child ৭৫
Madina Sultana

To Mom ৭৬
Shumaila Maryam

The Blank Space ৭৯
Archan Dasgupta

আমার বাবা

অমৃতা ব্যানার্জী

প্রথমেই বলি বাবার জীবনের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা বা ধৃষ্টতা কোনোটাই আমার নেই। এককথায় সবুজ সেনের ছবি বললেই চোখের সামনে যেটা ভেসে ওঠে সেটা হল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সদাহাস্যময় নির্ভীক এক মানুষ, সিগারেটের ধোঁয়ায় ধূমায়িত ঘরে একরাশ নকশাল নেতা সুবোধ মিত্র, কানু সান্যাল, রবিশঙ্করজী, উমাধর সিং, অসিত সিনহা বা এম.এইচ কৃষ্ণাপ্পার সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন।

অত্যন্ত ছোটো বয়সে এটাই ছিল আমার কাছে বাবার ছবি। আমাদের বাড়িতে প্রচুর বই ছিল। প্রায় একটা ছোটোখাটো লাইব্রেরির মত। বাবাকে দেখতাম দাদুর টেবিলচেয়ারে স্তূপীকৃত বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতে। সারাদিন ধরে প্রচুর মানুষ আসতেন বাবার কাছে। হয় পলিটিক্সের নয় কলেজের, নয়তো বা সাধারণ মানুষ কোনো সাহায্য চাইতে।

একবার হয়েছে কি টোটন বলে এক ভদ্রলোক দরজার বেল বাজিয়েছেন। বাবা অমনি আমাকে বলতে বললেন যে – গিয়ে বল যে বাবা বাড়িতে নেই। আমি তো গিয়ে বললাম যে বাবা বাড়িতে নেই। অমনি ভদ্রলোক আমার গাল টিপে বললেন যে ''বাবা বললেন বাবা নেই ?'' আর একবারও বাবা ঠিক এমনই করেছিলেন। এক ভদ্রলোক এসেছেন, দরজার কড়া নেড়েছেন। এবারও বাবা বললেন যে বল আমি নেই। আমি দোতলার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছি। ভদ্রলোক বললেন – ''সবুজ আছে ?'' আমি বললাম, ''না, বাবা তো নেই''। ততক্ষণে বাবা ঐ ভদ্রলোকের গলা শুনে বুঝতে পেরেছেন যে কে এসেছেন। বাবা অমনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন যে, ''না, না শিবুদা আমি আছি।''

বাবার কাছে ছিল প্রচুর গল্পের সংগ্রহ। আমি পড়তে বসলেই বাবা বাবার গল্পের ঝুলি খুলে বসতেন। আর মা রাগ করতেন। সবার মায়েরা বলেন যে তাড়াতাড়ি পড়তে বোস, না হলে বাবা অফিস থেকে এসে বকবে। কিন্তু আমাদের বেলায় ছিলো তার ঠিক উল্টোটা। মা বলতেন যে, তাড়াতাড়ি পড়া শেষ কর। এক্ষুণি বাবা কলেজ থেকে এসে যাবেন। আর পড়া হবে না।

এইরকমই অনেক গল্পের মধ্যে একটা গল্প হল – বাবা ছোটোবেলায় এক মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে যেতেন। ভদ্রলোক বাড়িতে একাই থাকতেন। সেই মাস্টারমশাই আবার বাবাদের পড়া দিয়ে বাজার করতে যেতেন। ফিরে এসে তাকে রাখা মধু আর কিছু আয়ুর্বেদিক ওষুধ খল-নুড়িতে বেটে খেতেন। রোজকার মতো সে দিনও ভদ্রলোক বাজারে গেছেন। আর আমার বাবার মাথায় চেপেছে দুর্বুদ্ধি। বাবা তাকে রাখা ঐ মধুটা চাখতে চাখতে পুরো শেষ করে ফেলেছেন। তখন কি হবে? বাবা তখন রান্নাঘর থেকে সরষের তেল এনে ঐ শিশিতে ঢেলে রেখে দিয়ে খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করছেন। যথাসময়ে মাস্টারমশাই ফিরেছেন এবং ওষুধও খেয়েছেন। কিন্তু ওষুধ মুখে দিয়েই গর্জন করে উঠলেন মাস্টারমশাই। ''সবজে, তুই ছাড়া এটা কারো কাজ নয়।'' ঐ অতগুলো ছেলের মধ্যে এ কাজটি যে কে করতে পারে যে বিষয়ে ভদ্রলোকের সম্যক জ্ঞান ছিল।

ছোটোবেলায় খুব হাতে-পায়ে দুরন্ত ছিলেন বাবা। বিচ্ছু বললে ভুল হত না। একবার পাঁচিল বেয়ে একটা বাড়ির ছাদে উঠেছিলেন বাবা ঘুড়ি ধরতে। ছাদের মধ্যে এক ধাপ উঁচু একটা জায়গা ছিল। তার ওপরে টিন বেছানো ছিল। আসলে টিনের তলায় ছিল গর্ত। কী খেয়াল হয়েছে বাবা ঐ টিনের ওপর পা দিয়েছেন। যেই না পা দেওয়া, অমনি টিন ভেঙে সোজা একতলায়। তাও আবার একটা গরম কড়াইয়ের মধ্যে। খুব ব্যথা পেয়েছেন কোমরে। এমন সময়ে দেখেন কারা যেন বাবার কান ধরে টানছে। আসলে ঐ বাড়িতে কোনও মহিলা

ছিল না। কতগুলো ব্যাচেলার লোক থাকত। অফিস যাবে বলে তারা রান্না করে রেখেছিল। আর বাবার দুষ্টুমিতে সব রান্না নষ্ট হয়ে গেছে।

বাবা ছোটোবেলায় খুব রোগে ভুগতেন। পাড়ার লোকেরা বাবাকে বলত – তোকে তো দেখি হয় খাটে, নয় মাঠে। তাহলে তুই পড়িস কখন। তথাকথিত স্কুলের সিলেবাসের বই বাবা খুব কমই পড়তেন। একবার বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশনের এক মাস্টারমশাই বাবাকে বলেছিলেন যে প্রিন্সিপালের ছেলে তুই মিউনিসিপ্যাল হবি। আরেকজন গৃহশিক্ষক তো পড়ানো ছেড়ে চলেই গেছিলেন। যাবার সময় আমার ঠাম্মাকে বলে গিয়েছিলেন যে আর যাই হোক ওর দ্বারা পড়াশোনাটা হবে না।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগের দিন চিড়িয়াখানা ঘুরতে গিয়েছিলেন বাবা। আর একবার তো পাড়াতে বাবা ঘুরছেন, কলেজের এক ছেলের সঙ্গে দেখা। বাবা জিজ্ঞেস করলেন কোথায় যাচ্ছিস ? ছেলেটি বলে কেন পরীক্ষা দিতে। বাবা ভুলেই গেছেন যে সেদিন পরীক্ষা আছে। অমনি জামাকাপড় পালটে বাবাও দে ছুট।

বড় হয়েও তাঁর এ স্বভাব খুব একটা বদলায়নি। এম.এস.সি পরীক্ষার সময় বাবা ইউনিভার্সিটির গেটে স্ট্রিট কর্ণার করছেন। পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। কোনোমতে বন্ধুরা তাঁকে মঞ্চ থেকে টেনে নামায়। তারপর ঘাড়ে, মাথায় জল দিয়ে সোজা পরীক্ষার হলে। পরীক্ষা তখন শুরু হয়ে গেছে। রেজাল্ট বেরোলে দেখা গেল তিনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট গোল্ড মেডেলিস্ট।

আসলে বাবার মেধাটা ছিলো অসাধারণ। বেশী পড়তে হত না। অল্পেতেই হত।

মহাশ্বেতা দেবীর লেখা তুতুল বলে একটা বই আছে। মহাশ্বেতা দেবী ওনার বাবাকে তুতুল বলে ডাকতেন। তুতুল খুব মজার মানুষ ছিলেন। আবার খানিকটা 'ঘর জ্বালানি পর ভোলানিও" বটে। আমার বাবার সাথে আমি তুতুলের খুব মিল পাই।

সেদিন আমার মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা। দীপক জেঠু, মানে নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক দীপক মুখোপাধ্যায় আমাদের বাড়িতে পাঠালেন ইউরেকা ফোর্বসের এক সেলসম্যানকে। ইউরোক্লিন দেখে তো বাবা খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন। সেলসম্যানকে বাবা ডেমো দেখাতে বললেন। ব্যাস, বাবা আর সেই লোকটা মিলে আমার ভিজে চুল শুকনো করতে লেগে গেলো। আমি আর মা তো রেগেই লাল। বাবা বললেন, পরীক্ষার দিন অত পড়তে নেই। সব পড়া তো আগেই হয়ে গেছে।

তারপর তো আমি পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এলাম। এসে দেখি বাবা বাবার চ্যালা আমার পিসতুতো দাদাকে নিয়ে ওনার স্টাডির সমস্ত বই ইউরোক্লিনের ব্লোয়ার চালিয়ে পরিষ্কার করছেন। আর ফলে যেটা হচ্ছে সেটা হল সমস্ত ধুলো সারা ঘর জুড়ে উড়ছে। কিছুক্ষণ বাদে বাবাদের কাজ হয়ে গেল। বাবারা রণে ভঙ্গ দিলেন। তখন গম্ভীর মুখে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন আমার মা। শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে ঝাঁটা নিয়ে সারা বাড়ি পরিষ্কার করলেন।

বাবা ভালবাসতেন বেড়াতে যেতে। জীবনে যা উপার্জন করেছেন তার বেশির ভাগটাই বাবা বই কিনে আর বেড়িয়েই শেষ করে দিয়েছেন। আমরা বছরে প্রায় দু'বার করে বেড়াতে যেতাম। পুজোর ছুটির সময় তো বটেই অন্যসময়েও ছোটোখাটো ট্যুর হত। পুজোর সময় বেড়াতে যাবার অন্তত তিন-চার মাস আগে থেকে বেড়াতে যাবার প্ল্যান হত। আমার প্রত্যেকটা খাতার পেছনে কবে যাত্রা শুরু, কখন ট্রেন থেকে নামলাম, কদিন হোটেলে থাকলাম সব কিছুর একটা ছক লেখা হয়ে যেত। আর প্রত্যেকটা খাতার পেছনে আলাদা আলাদা বেড়াতে যাবার ছক হত।

বেড়াতে যাবার আগে অনেক দিন থেকে চলত যেখানে যাচ্ছি সেখানকার সম্বন্ধে পড়াশোনা। মাঝে মাঝেই ক্যুইজের তীর ছুটে আসত আমাদের দিকে। খাওয়ার টেবিলটা ছিল এই সব নানা দেশ-বিদেশের জ্ঞান আহরণের জায়গা। আমাদের মাও এই ক্যুইজ বা পড়াশোনা থেকে বাদ যেতেন না। এমনকি আমাদের বিয়ের পর জামাইরাও এই তালিকাভুক্ত হল।

একবার শিমুলতলায় বেড়াতে গিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোকের মুখ নাকি বাবার কাছে জিবেগজার মত মনে হল। বাবা অমনি জড়িয়ে জড়িয়ে একটু দূর থেকে ভদ্রলোককে জিবেদা বলে ডাকা শুরু করলেন। আশ্চর্যের বিষয় উনিও ঐ ডাকে সাড়া দিতেন। আর আমরা তো সব হেসেই কুটোপাটি।

বাবার সঙ্গে মায়ের সম্পর্কও খুব রোম্যান্টিক ছিল। কলেজ থেকে ফিরে কলেজের সব খুঁটিনাটি গল্প মা শুনতে না চাইলেও মাকে বলা চাই। খুব পেছনে লাগতেন মায়ের। আর বাবার সব লেখার প্রথম পাঠিকা মা।

বাবার এই বিরাট সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন মার নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হত না সেটা বাবাও স্বীকার করতেন। দিনের পর দিন বাইরের সব রাজ্য থেকে লোক এসে থাকতেন আমাদের বাড়িতে। আর মা কিলো কিলো রান্না করতেন। বাবা সকালবেলা এঁদের বাড়িতে রেখে কলেজে চলে যেতেন। মা এঁদের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ইংলিশে দিব্যি কথোপকথন চালিয়ে যেতেন। খেতে দিতেন। কখনও কখনও সারাদিন, সারারাত ধরে মিটিং চলত। কানু সান্যালকে দিনের পর দিন আমাদের বাড়িতে থাকতে দেখেছি। ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এম. এইচ. কৃষ্ণাপ্পা, আমার দাদু। সুদূর মাদ্রাস থেকে উনি আসতেন। ওঁর কথা খুব মনে পড়ে।

সবুজ সেন ছাত্রজীবনেই রাজনীতি শুরু করেছিলেন। প্রথমে খুব অল্প দিনের জন্য কংগ্রেসী রাজনীতি করতেন – এই এক দেড় বছর হবে। তারপরে আসেন Students union SFI-তে। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর চিন্তায়, মননে পরিবর্তন আসায় যোগ দেন ষাটের দশকের

নকশালবাড়ি আন্দোলনে। নকশালপন্থীরা এটাকে গণ আন্দোলন হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তবে বাবা কোনোদিনই চারু মজুমদার পন্থী CPIML-এর দিকে যাননি।

এরপর সবুজ সেন আর কোনোদিনই থেমে থাকেননি। ১৯৭৫-৭৬ সাল নাগাদ বনবিহারী চক্রবর্ত্তী সঙ্গে নিয়ে গঠন করেন লিবারেশন ফ্রন্ট আর নব্বইয়ের দশকে সি.ও.আই. (এম.এল)। দুটি সংগঠনই ছিলো জাতীয় স্তরের এবং প্রতিটি দলেই তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বনবিহারী চক্রবর্ত্তী ছিলেন আমার মায়ের বাবা।

নৃতত্ত্ব, মাকর্সবাদ, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে বাবার জ্ঞান ছিল গভীর থেকে গভীরতর। শেষ দিন পর্যন্ত বাবার এই জ্ঞানতৃষ্ণা জীবিত ছিল। এমনকি মাঝে মাঝেই ছোটোবেলার পড়ার কোনো বিষয় মনে করতে না পারলে নাতিকে জিজ্ঞেস করতেন।

অসংখ্য লেখালিখি করেছেন সারা জীবন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে অমল ঘোষ ছদ্মনামে লিখে ফেললেন মূর্তিভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন বিদ্যাসাগর। তারপর ইন্দিরা গাঁধীর মৃত্যুর সময় লিখলেন Assassination of a Tyrant, Continuity of Democratic Dynasty। মণ্ডল কমিশন নিয়ে রিপোর্ট বের হবার পর খুব মনোজ্ঞ একটি লেখা লিখেছিলেন। আসলে যখনই সমাজকে নাড়িয়ে দেবার মত কোন ঘটনা ঘটেছে তখনই বাবার কলম গর্জে উঠেছে। অন্বেষা, হাতুড়ী, Liberation Front ইত্যাদি তাঁর সম্পাদনায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা।

রাজনীতির প্রয়োজনে রাস্তায় রাস্তায় স্ট্রিট কর্ণার করেছেন। বার্ণ স্ট্যান্ডার্ডের কথা তার মধ্যে খুব মনে পড়ে। সংগঠনের কাজে ছুটে গেছেন বিভিন্ন প্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে। একেবারে কুলি, মজুর শ্রেণীর মানুষের ঘরে গিয়ে থেকেছেন, খেয়েছেন। এরকম অনেক মানুষ সাহায্যের জন্য আমাদের বাড়িও আসতেন। বাড়ি তখন লোকে গমগম করত। আর মা সারাদিন ধরে হাসি মুখে চা করতেন। বাড়িতে পড়াশোনা, প্রুফ রিডিং, মিটিংয়ের প্রস্তুতি, ফেস্টুন তৈরী, গণসঙ্গীত গাওয়া এই সব লেগেই থাকত।

রাজনীতির প্রয়োজনে অনেকবার জেলেও গেছেন তিনি। একবার রায়গঞ্জের জেলে মাসখানেক ছিলেন। একবার তো মিটিং করতে করতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে গিয়েছিলেন। কোনো খোঁজ ছিল না প্রায় মাসখানেক। বাবার খুব সাহস আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল। বাবা তখন C.O.I.(M.L.)-এ। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাঁধী আচার্য হয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। আর বাবা ওঁকে দেখালেন কালো পতাকা। ব্যাস পরের দিন সব কাগজে হেডলাইন। আনন্দবাজার পত্রিকা লিখলো – ''আম্রকুঞ্জে সমাবর্তনে নকশালপন্থী বিক্ষোভ।''

বাবা নিজের মত কখনও কারোর ওপর চাপিয়ে দিতেন না। নিজে পুরোদস্তুর কমিউনিস্ট ও নাস্তিক হয়েও খুব ছোটোবেলায় আমাকে নিজের হাতে সরস্বতী ঠাকুর কিনে দিতেন। মা সাজিয়ে দিতেন। খানিকটা পুজো পুজো খেলা করতাম।

কলেজ বাবার প্রাণ ছিল। ছাত্রছাত্রীদের অকুণ্ঠ ভালবাসা পেয়েছেন তিনি। তেমনি আবার সেইরকম ভালোও বেসেছেন। সবুজ সেন একজন নামকরা নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। বাবার পড়ানোর কৌশলে ছেলেমেয়েরা বশীভূত হয়ে যেত। নৃতত্ত্বের সব ধারা সোশ্যাল কিংবা ফিজিক্যাল- এ তাঁর সমান দক্ষতা ছিল।

বাবা নরসিংহ দত্ত কলেজের সহ-অধ্যক্ষও হয়েছিলেন। তখন তো ব্যস্ততার শেষ নেই। আমাদের বাড়িটাই যেন কলেজের অফিসঘর হয়ে উঠেছে। কত লোক, কত ছাত্রছাত্রী যে আসত। তখন বাবার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল কী করে কলেজের উন্নতিসাধন করা যায়।

নৃতত্ত্ব বিভাগে উনি অনার্স চালু করেছিলেন। অনেক ছাত্রছাত্রীর মুখে শুনেছি বাবার নিয়মানুবর্তিতায় কেউ কোনো ক্লাস বাঙ্ক করতে সাহস পেত না। পুরো কলেজেই একটা dicipline-এর বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল। আমি নিজেও নরসিংহ দত্ত কলেজের ছাত্রী। ফলত আমি নিজেও দেখেছি যে কী রকম নিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়াতেন। বাবার সময়েই কলেজে অধ্যক্ষ জ্ঞান সেন জন্মশতবার্ষিকী গোটা একবছর ধরে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। সেমিনার, ক্যুইজ, বক্তৃতা ইত্যাদি। মূলত বাবার উদ্যোগেই এটা সম্ভব হয়েছিল। প্রসঙ্গত অধ্যক্ষ জ্ঞান সেন ছিলেন নরসিংহ দত্ত কলেজের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা এবং আমার পিতামহ। বাবা vice principal থাকতে থাকতেই NAAC-এর team কলেজে আসে এবং তারা কলেজের পঠনপাঠন ও সার্বিক উন্নতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। আমাদের কলেজকে NAAC B++ grade দিয়েছিলো।

আর ছিলো excursion। বাবার জীবনের একটা বড় জায়গা জুড়ে ছিল excursion বা field work। বাবা খুব দক্ষ ছিলেন এই কাজে। বাবার পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীরাও খুব ধৈর্য ধরে, মন দিয়ে, ভালবেসে এই কাজ করত। নিজে হাতে বাবা ছেলেমেয়েদের কাজ দেখিয়ে দিতেন। আর field থেকে ফিরেই বাবা field-এর রকমারি গল্পের ঝুলি খুলে বসতেন।

সারাদিনে বাবার কলেজ time আর শেষ হত না। ক্লাস শেষ হবার পরেও staff room-এ চলত ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা। কলেজের নতুন প্রজন্মের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাবার খুব স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাঁরা অনেকে বাবার কাছে অনেক কিছু বিষয় শিখেও নিতেন।

বাবা সারাজীবনে অনেক লেখালিখি করলেও বলতে গেলে ওঁর যেটা নিজের বিষয় সেই নৃতত্ত্ব বিষয়েই উনি খুব একটা বেশী বই লেখেননি। একটি বই লিখেছিলেন "মানুষের বিবর্তন"। বইটা এত সুন্দর, প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা যে, যে কোনো ব্যক্তিই এটা পড়ে তার মর্মোদ্ধার করতে পারবে। এই শেষজীবনে এসে মারা যাবার কিছুদিন আগে বাবা নৃতত্ত্বের আরেকটা লেখাতে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বইটা শেষ করে যেতে পারেননি।

ঋজু মেরুদন্ড, সাহসী, আদ্যন্ত বামপন্থী, নাস্তিক এই মানুষটার জীবনে অনেক বৈপরীত্য ছিলো। যে মানুষটা এত হাসিখুশি সেই মানুষটাই রেগে গেলে চণ্ডাল। বাবার রাগ খুব বিখ্যাত ছিল। যেমন ছাত্রদরদী ছিলেন, তেমনি ছাত্রছাত্রীরা ভয়ও পেত। ছাত্রছাত্রীদের অতি সামান্য ভালো গুণের পরিচয় পেলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। এজন্য বাবার ছাত্রছাত্রীদের আমি খুব হিংসে করতাম। পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে ভালবাসতেন মানুষটা। নিজে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমাদের পুজোর জামা কিনে দিতেন, কবিতা পড়ে শোনাতেন। আমাদের নিয়ে গিয়ে ক্যাসেট কিনে দিতেন।

এহেন মানুষটা শেষের দিকে খুব ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। লেখাপড়ার কাজ বা জ্ঞানচর্চা বজায় ছিল ঠিকই কিন্তু অবসর নেওয়ার পর থেকে বাড়ির বাইরে বেরোতে চাইতেন না। শরীরচর্চা করতেন না। পরিবারের লোকজনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন খুব। জামাইদের খুব ভালবাসতেন। সবসময় কাছে চাইতেন।

২০১৬ সালে নিউমোনিয়া হয়ে একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরি হসপিটালে প্রায় মাসখানেক ভর্তি ছিলেন। তারপর থেকে শরীরটা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু মনটা খুব সতেজ ছিল। সবসময় positive কথাবার্তা বলতেন। ভাবতেন আবার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু খানিকটা নিজের দোষেই খুব ভুগতেন। গোটা একমাস সুস্থ থাকতেন না। বাঁচতে চাইতেন প্রাণ ভরে। খালি বাইরে বেড়াতে যাবার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু শরীরটা বাধা হয়ে দাঁড়াত। শেষ দিন অবধি তিনি লিখে গেছেন। মনের মধ্যে নতুন নতুন চিন্তারা যে ছট্‌ফট্ করত তা ফোন করে ওঁর রাজনৈতিক সতীর্থদের সে কথা জানাতেন।

কোভিড আক্রান্ত না হলে হয়তো আরো কয়েকটা বছর আমরা বাবাকে পেতাম। আসলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা আর তাঁর প্রায় ছিল না বললেই চলে। বড় বাঁচার সাধ ছিল মানুষটার। বড় জামাইকে সবসময় বলতেন তোমরা আমাকে অন্তত চার-পাঁচ বছর বাঁচিয়ে রাখো। আমার অনেক কাজ করা বাকি রয়ে গেছে, কত লেখা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। হাসপাতালের বেডে শুয়ে বারবার বলেছিলেন আমার লাঠিটা আর চটিটা দিয়ে যা। আমি বাড়ি যাবো। শেষ ইচ্ছা ছিল দেহদান করার। কিন্তু তাঁর দেহ কোভিডের কারণে গ্রহণ করা হল না। আর আফশোস রয়ে গেল যে শেষযাত্রায় যখন যাত্রা করলেন মার্কসবাদী নেতা সবুজ সেন তখন তার গায়ে জড়ানো ছিল একটা কালো প্লাস্টিক। তাঁর দিনবদলের স্বপ্নের লাল শালু যেটা তিনি দাবি করতেন তা আমরা তাঁকে দিতে পারিনি। ওঠেনি মুর্হুমুহু লাল সেলাম ধ্বনি।

লেখিকা অমৃতা ব্যানার্জী সবুজ সেনের বড়ো মেয়ে

সবুজ সেন: স্মার্ট অ্যান্ড শার্প

দীপক মুখার্জী
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ

কোনো ছেলে বা মেয়ের নাম 'সবুজ', এটা আগে কখনো শুনিনি। 'সবুজপত্র' শুনেছি, 'সবুজ-সঙ্ঘ' শুনেছি। আবার, শুধু 'সবুজ' নয় – সবুজ সেন, ছন্দ-বদ্ধ, ঝকঝকে – একটা ছুরির মতো ''স্মার্ট অ্যান্ড শার্প''।

সবুজ, আমি এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগে পলক শী, পদার্থবিজ্ঞানে কিশোরীমোহন পাল, গণিতশাস্ত্রে সুনন্দা রায়চৌধুরী (হয়তো আরও কেউ আমার জানার বাইরে) একই দিনে ২২ আগস্ট ১৯৬৬ – নরসিংহ দত্ত কলেজে যোগদান করি। আমার বয়স তখন ২৬ বৎসর, সবুজের ১৯ বৎসর! সেই বছরই বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বায়োসায়েন্সে (পাসকোর্স) বি.এস.সি. পাশ করে সবুজ উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ডেমনস্ট্রেটর পদে নিযুক্ত হয়। সেই সময়ে সবুজ কলেজে শিক্ষকদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

১৯৬৪ সালে নৃবিজ্ঞান বিভাগ প্রবর্তিত হলে শ্রী মুকুল চক্রবর্তী বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। পরের বছর শ্রী কানাই লাল ভৌমিক (আমার ঘনিষ্ঠতম সহপাঠী) যোগদান করে এবং ১৯৬৬-তে আমি নৃবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করি। অর্থাৎ নৃবিজ্ঞান প্রকৃত অর্থেই একটা তরুণ বিভাগ – কলেজে অর্বাচীন। তুলনায়, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ কিছুটা বয়ঃজ্যেষ্ঠ, তাই সেখানে বয়সের ভারটা বেশি। তাই, কেবলমাত্র প্র্যাকটিকাল ক্লাসের দায় সেরে, আড্ডাবাজ সবুজ বাকি সময় আমাদের সাথেই কাটাত। আমরাও ওকে আমাদের বিভাগেরই একজন হিসাবে গণ্য করতাম।

১৯৬৬-৬৮ সময়কালে নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কাঠামোতে এক শক্তিশালী আঘাত হানে। ফলে প্রতিষ্ঠিত পার্টি (সি পি আই এম)-এর সঙ্গে অনিবার্য সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে। সবুজের ভিতরে গোড়া থেকেই কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি ঝোঁক ছিল এবং নকশালবাড়ির স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের অভিঘাত সঙ্গত কারণেই সবুজকে আকৃষ্ট করেছিল। সেই সময় আমি এবং মুকুলদা সবুজকে নৃবিজ্ঞানে পরবর্তী পর্যায়ে ডিগ্রি অর্জনে উৎসাহিত করি; কারণ, আমরাও চাইছিলাম, সবুজের মতো একটা তাজা এবং মেধাবী যুবক যদি এই বিভাগে যুক্ত হতে পারে তবে বিভাগটি আরও সমৃদ্ধ হতে পারবে। সেটা শুরু করার জন্য আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক শ্রী বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লিখে সবুজকে ওঁর সাথে দেখা করতে বলি। সবুজ সেটা করেছিল। বিশ্বনাথদা আমাকে কোনো প্রশ্ন করেননি এবং ঠিক চার বছর পরে সবুজ নৃবিজ্ঞানে স্বর্ণপদক লাভ করে সম্ভবত ১৯৭৩ সালে নৃবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়। ইতিমধ্যে, ১৯৬৯ সালে শ্রী কানাই ভৌমিক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রুরাল সোসিওলজি বিভাগে যোগদান করে। ফলে, সেই শূন্যস্থানে শ্রী সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত নিযুক্ত হন। অন্যদিকে, সেই বছরেই প্রাতঃকালীন বিভাগে নৃবিজ্ঞান পঠনের ব্যবস্থা চালু হওয়ায় শ্রীমতী লাখু নন্দী পূর্ণ সময়ের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন এবং আমরা তিনজন আংশিক সময়ের দায়িত্ব পালন করি। এইসব বিকাশের ফলে ১৯৬৪-১৯৬৯, এই পাঁচ বছর সময়কালে নৃবিজ্ঞান বিভাগ প্রথম যৌবনে পদার্পণ করে।

১৯৭৩ সালে সবুজ যখন নৃবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগ দেয় তখন আমাদের কলেজের বায়োসায়েন্স বিভাগ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং সুনাম অর্জন করেছে। সবুজের যোগদানে সেই খ্যাতি আরও একটু জোরদার হয়।

সবুজের চরিত্রের কয়েকটি দিক উল্লেখ না করলে এ লেখাটার কোন অর্থই দাঁড়াবে না। প্রথমত, ওর ভেতরে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই একটা নেতৃত্বের ঝোঁক ছিল ; যেটা বিষয় নিরপেক্ষভাবে সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ করা যেত। সেটা আমাদের মধ্যে পাঠ্য বিষয়ের ভাগ-বাটোয়ারার ক্ষেত্রে হোক ; অথবা কোথায় এবং করে ক্ষেত্র সমীক্ষা করানো (যেটা পাঠ্যসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ) হবে, কোথায় থাকা হবে, কোন গ্রামে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে; দৈনন্দিন রুটিন কি হবে, প্রশিক্ষণ কালে সকলের খাওয়াদাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে; আমরা কে কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেব, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে নিয়ে নিত – নিতে ভালোবাসতো। সেই সূত্রে কিছু অহমিকা ও আত্মপ্রশস্তির প্রকাশ কিছু দোষনীয় নয়।

চরিত্রের আর একটি দিক ছিল ভ্রমণের প্রতি তীব্র আগ্রহ। হিমালয় প্রায় নেশায় মতো হয়ে গিয়েছিল – গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, গোমুখ, কেদার-বদ্রী ইত্যাদি ছাড়াও ডালহৌসি, রানিক্ষেত, নৈনীতাল, কুলু-মানালি প্রভৃতি অসামান্য সৌন্দর্যের সম্ভারে সমৃদ্ধ স্থানে বারে বারে ফিরে ফিরে যাওয়া একটা নেশার মতো ওকে আকর্ষণ করতো। সঙ্গে ছিলো সমভাবাপন্ন আবাল্য কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধু। এইসব মিলে এমন রোমান্টিক পরিমণ্ডল তৈরি হত যেটা বেশি দূর এগোতে পারেনি – বাদ সাধত শারীরিক অসুস্থতা – যেটা প্রায় এঁটুলির মতো ওর সঙ্গে জুড়ে থাকত। সর্বোপরি, সম্ভবত ১৯৮৩-তে ওর হার্টে বাইপাস সার্জারি করা হয়।

কলেজে ক্লাস নেওয়া, কলেজ পরিচালন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিষয়ে খোঁজ খবর রাখা, নির্বাচিত বন্ধুদের সাথে আড্ডা-তাস- ক্যারম ইত্যাদির সাথে হয়তো অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে

চলছিল বামপন্থী রাজনীতির সামগ্রিক মতাদর্শের সঙ্গে নকশালবাড়ি রাজনীতির অন্দরমহলে সাবলীল ঘনিষ্ঠতা এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় পুস্তক-পুস্তিকা-প্রবন্ধে ইত্যাদির মাধ্যমে অবিশ্রাম মতাদর্শগত রচনা লেখা এবং সময়ে সময়ে ভারতের বিভিন্নস্থানে সমমতাদর্শী কমরেডদের সাথে আলোচনা-বিতর্ক ইত্যাদির নিরন্তর চর্চা দূরবর্তী একটা কোন স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, স্বনামখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক শ্রী বনবিহারী চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, ঘনিষ্ঠ তা এবং নকশালবাড়ি রাজনীতির সঠিক লাইনে দীক্ষা লাভ এবং শ্রী বনবিহারী চক্রবর্তীর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর কন্যা-পত্রলেখাকে বিবাহ করা। অবশ্য পরবর্তীকালে, সবুজ তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের নিয়ে একটি নতুন পার্টির জন্ম দিয়েছিল - 'কমিউনিস্ট অর্গানাইজেশন অব ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট)'। সংক্ষেপে, COI(M-L)।

কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসাবে সবুজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ করেছিল। কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করেছিল, সেটা হল ১৯৯৪ সালে অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনের শতবর্ষ উদ্‌যাপন এবং বর্ষব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা এবং নানা অনুষ্ঠান পালন করা। আমার বিচারে, এই শতবর্ষ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন-কে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা জ্ঞাপনের মাধ্যমে হাওড়া জেলার প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম কলেজের রূপকারের প্রতি উত্তরসূরীর কর্তব্যের অন্তত কিছুটা পালনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। কোনো ব্যক্তির তাঁর নিজের পিতার শতবর্ষ পালন করতে গেলে যে স্বাভাবিক কুণ্ঠা ও জড়তা থাকে, সবুজ যে সেটা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল, সেটা খুবই আনন্দের বিষয়।

শতবর্ষ উদ্‌যাপনের তেরো বছর আগে, ১৯৮১-তে শিক্ষক পরিষদের পক্ষে ''অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন স্মৃতি আলোচনামালা'' শিরোনামে আলোচনাচক্র উপসমিতিতে বিভিন্ন সময়ে আলোচিত প্রবন্ধাবলী – প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রকাশনার সার্বিক দায়িত্ব পালনের সূত্রে আমাকে অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতে হয়েছিল এবং তখন পর্যন্ত কলেজে অধ্যক্ষ সেনের কোন প্রতিকৃতি না থাকায় অধ্যক্ষ সেনের ছোটো জামাতা, শ্রীজীব গঙ্গোপাধ্যায়কে অনুরোধ করে অত্যন্ত সুন্দর এবং জীবন্ত প্রতিকৃতি অঙ্কন করাতে পেরেছিলাম। বর্তমানে উক্ত প্রতিকৃতিই একমাত্র প্রতিকৃতি হিসাবে অধ্যক্ষের কক্ষে শোভা বর্ধন করছে।

সবুজ একটা বর্ণময় চরিত্র, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে, নানা বর্ণের ফাঁকে ফাঁকে যে খানিক অন্ধকার থাকে, সেটাও অস্বীকার করার নয় এবং সেটা নিতান্ত বাস্তব। কলেজীয় সম্পর্কে আমি সবুজের অগ্রজ সতীর্থ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তো নিজেকে অগ্রজ ভ্রাতা হিসাবেই বিচার করেছি। নকশালবাড়ি রাজনীতির প্রারম্ভিক পর্বে যে তরঙ্গ বিক্ষেপ ছিল তা থেকে কিছুটা আড়াল করা ও সেই সঙ্গে নৃবিজ্ঞান বিষয়ে ওর মানোন্নয়নে আগ্রহী হই এবং সবুজ সেটা ষোলো আনার ওপরে আঠারো আনা সার্থকতার সঙ্গে নিষ্পন্ন করেছিল – আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমার চাহিদা পুরোপুরি মাঠে মারা যায়। কেন?

সেই সময়ে স্নাতক পর্যায়ে উপযুক্ত কোনো পাঠ্যপুস্তক (বাংলা বা ইংরাজী) না থাকায় পঠনপাঠনটা শিক্ষকের দয়াদাক্ষিণ্য তথা যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল ছিল। আমার বাসনা ছিল যা আমি একাধিকবার প্রকাশ করেছিলাম আমরা চার-পাঁচ জন অধ্যাপক মিলে যদি পরিকল্পিতভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দুটো সেশনে ছাত্রদের পাঠ্যবিষয় লিখিতভাবে তৈরি করে দিতে পারি, তবে বছর পাঁচেক-এর মধ্যেই আমরা অন্তত স্নাতক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক তৈরি করে দিতে পারতাম। সেক্ষেত্রে ছাত্রদেরও প্রাইভেট নোটের উপর নির্ভরতা কমত।

আশা ছিল, সবুজ বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করবে। বাকি দায়িত্ব আমরা ভাগ করে নিতে পারতাম। কিন্তু সবুজ সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখায়নি। এতে আমি নিতান্ত আশাহত হয়েছিলাম এবং বলতে দ্বিধা নেই, সবুজের নৃবিজ্ঞানে স্বর্ণপদক প্রাপ্তি ওর ব্যক্তিগত গৌরব বৃদ্ধি করেছিল – বিষয় নৃবিজ্ঞান সে ব্যাপারে কোনোভাবেই উপকৃত হয়নি। এটা আমাদের নিতান্ত খেদের বিষয়। আমি ওকে অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বিভিন্ন কলেজে নৃবিজ্ঞান শিক্ষকদের পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা সম্পর্কে ওর এত হতাশাব্যঞ্জক ধারণা ছিল যে নিজেকে তাদের মধ্যে একজন ভাবতে ওর কুণ্ঠা বোধ হত।

ওর সেই মানসিকতাকে মান্যতা দিয়েই বলেছিলাম, – ''এটা অনস্বীকার্য যে, আমরা প্রায় সবাই 'মধ্য মেধা' বা 'নিম্ন মেধার' শিক্ষক; কিন্তু তুমি তো তোমার মেধার পরিচয় দিয়েছ। সেই জন্যেই তো তোমাকে বলছি।'' কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। নৃবিজ্ঞান সবুজ সেনের কাছ থেকে কিছু পেল না। এটা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। এটা সবুজের কোনো নিন্দা নয়, আমাদের অতৃপ্তি – নৃবিজ্ঞানের দুঃখ।

সহকর্মী সবুজ সেন

সন্ধি কুমার বেরা
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

কলেজে আমার প্রথম কিছু বছর সান্ধ্য বিভাগে কেটেছে। দিনের বেলায় সহকর্মীদের সঙ্গে তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাছাড়া আমি খুব একটা মিশুকেও ছিলাম না। শিক্ষক পরিষদের সভা যোগাযোগের একটা কেন্দ্রস্থল ছিল এবং সবুজ সেনের সঙ্গে পরিচয়ও সেই পরিসরে। সবুজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ছিল কিছুদিন, ফলে ওর সঙ্গে যোগাযোগ ত্বরান্বিত হয়েছিল মনে হয়।

কলেজের চাকরিতে ও আমার চেয়ে কিছুটা আগেই এসেছিল কাজেই নিয়মে দাদা হওয়ারই কথা কিন্তু তা হয়নি। তবে আমরা বয়সে কিন্তু প্রায় সমান। কবে কখন আমরা তুইতে নেবে গেছি বহু পুরাতন কথা এখন আর মনে পড়ে না। চাকরির প্রথম জীবনে কলকাতার পরিচিত মহলে নরসিংহ দত্ত কলেজের নামের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় হরিপদ ভারতীর নাম শোনা যেত আর আমাদের মতো বয়সের অনেকের মুখেই বন্ধু সবুজ সেনের নাম শুনেছি। উভয়েরই পরিচিতি রাজনৈতিক। রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সবুজ মাঝে সরে আসে ফলে ও তখন কলেজেই বেশী সময় দিত। আমরাও যুবক থেকে বড়োদের দলে ঢোকার পথে। সবুজ বেশ কিছু সময় জুড়ে নানান কাজে আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছে। ব্যক্তিগত ভাবে সবুজের সঙ্গে আমার মতপার্থক্য যে হয় নি তা নয় তবে কলেজের ভালোতে আমরা একই সঙ্গে কাজ করেছি। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি, শিক্ষক পরিষদের সভায় আমাদের কাজকর্ম সংক্রান্ত অভাব অভিযোগ নিয়ে কথা বলার পূর্ণ সুযোগ আমাদের ছিল। কলেজের পঠনপাঠনে তার সুফল আমরা পেয়েছি। নেতৃত্বের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হয়েছিল। সবুজ সেন এই সাফল্যের কিছুটা দাবি করতেই পারে।

দুজনেই অনেক দিন হল কলেজ থেকে বিদায় নিয়েছি। বন্ধুত্ব কলেজকেন্দ্রিক থাকলেও অবসরের পর সেই বন্ধুত্ব অটুট থেকেছে। গত প্রায় ১৪/১৫ বছর দুজনের ফোনালাপ নিরবিচ্ছিন্ন থেকেছে। শেষ কয়েকমাস ওর কথাগুলোও পরিস্কার বোঝা যেত না ফলে কথা দীর্ঘস্থায়ী হত না। আমার দুঃখ ওর শেষ অনুরোধ — 'আমার এরিয়ারের টাকাটা ব্যবস্থা করে দে, তোরা ঠিকভাবে চেষ্টা করলে টাকাটা পেয়ে যেতাম। চিকিৎসার অনেক খরচ।' আমি বোঝাতে পারিনি আমি বা পার্থ (পার্থ সেন) চেষ্টার কোনো ফাঁক রাখি নি। বয়স বাড়লে মানুষ বড়ো অবুঝ হয়ে পড়ে, তাই হয়তো সবুজের মতো বুদ্ধিমান লোকও বুঝতে পারল না বা চাইল না সত্যটা। একই কারণে, আমরাও যারা এই টাকাটা পেতে পারি হয়তো চেষ্টার পদ্ধতিটা কী হওয়া উচিত বুঝতে পারিনি। বন্ধু কথা দিচ্ছি এত দিনের চেষ্টা বিফল হলেও ফল পেতে আর দেরি হবে না।

বন্ধু বিদায়, ওখানে তোর অনেক পুরাতন বন্ধুদের পাবি যারা অকালে বিদায় নিয়েছিল। তাদের সঙ্গে শান্তিতে থাক। আমরাও আসছি।

হে বন্ধু বিদায়

পার্থ সেন

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ

জ্যোতি বৌদি ফোন করে জানালেন, সবুজ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। জানতাম ওর শরীর ভালো ছিল না। জানতাম চিকিৎসা চলছে। কিন্তু, একেবারে চলে যাওয়া। সবুজের মেয়েকে ফোন করলাম। কথা বললাম। কেমন যেন বিশ্বাস হয় নি সবুজ চলে গেল। এই ত' এর আগেরবার আমরি (AMRI) হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে থাকার পরেও সুস্থ হয়ে সবুজ বাড়ি ফিরে এল। এবারে কি এমন হল যে, সবুজ চলে গেল। সবুজের স্মৃতিচারণ করতে হবে, এ কথা কখনো ভাবতে পারি নি।

সবুজ আমার কিছুটা আগে কলেজে যোগদান করে। সবুজের কথা আগেই শুনেছিলাম। কলেজে এসে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। আমাদের পরস্পরের প্রতি একটা টান ছিল। এই টান ছিল একসাথে স্বপ্ন দেখার টান। আমরা কেউ কারো প্রতিযোগী ছিলাম না। আমরা ছিলাম একে অপরের বন্ধু। এই প্রসঙ্গে বলি, আমাদের কলেজের অধ্যাপক চঞ্চল মিত্র একদিন গড়িয়াহাট মোড়ে আমাকে ডাকছেন 'এই সবুজ সেন', 'এই সবুজ সেন' বলে। আমি ফিরে গিয়ে তাঁকে বলি 'আমি পার্থ সেন, সবুজ সেন নই'। তিনি বললেন, ওই একই হল।

আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, চেষ্টা করেছি সেখানকার গণতান্ত্রিক পরিসরকে বিস্তৃত করতে। গণতান্ত্রিক পরিসর কতটা বিস্তৃত হয়েছে সেকথা অন্যেরা বলবে। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের পরিসর যে অনেক বিস্তৃত হয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। যে সময় আমরা কলেজে পড়াতে এসেছি সেই সময় মাস্টারমশাইদের বেতন ছিল যৎসামান্য। আমরা প্রায়ই আন্দোলন করতে বাধ্য হতাম। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ছিল আমাদের একমাত্র সংগঠন। এই সংগঠনে নানা মতের শিক্ষকরা ছিলেন। আমরাও ছিলাম। সাংগঠনিক নির্বাচনে আমরাও অংশগ্রহণ করি। আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে সবুজ সেন ও সলিল বিশ্বাস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে । আজ এই দুজনের কেউই আমাদের মধ্যে নেই। এঁরা দুজনেই অতি সম্প্রতি আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কলেজের স্টাফ রুমে চায়ের আড্ডায় সবুজের কোনো বিকল্প ছিল না। আড্ডা চলত নানা বিষয়ে।

সবুজ সেন কৃতী ছাত্র এবং শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েও কলেজের চার দেওয়ালের গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখার কথা কখনোই ভাবে নি। সমাজজীবনে নিজেকে আরো বিস্তৃত করার জন্য সরাসরি রাজনীতির কথা ভেবেছে। ষাটের দশকের

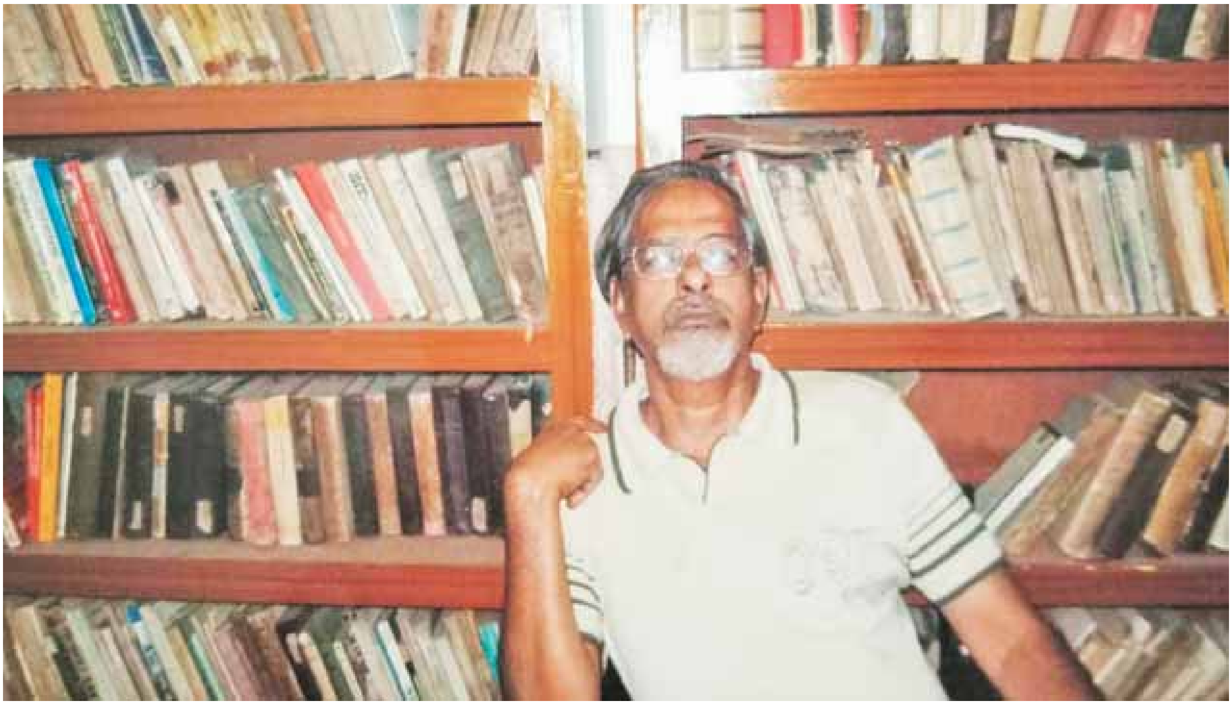

শেষে পশ্চিমবাংলার রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে। বামপন্থী রাজনীতিকরা ভাবতে থাকেন মুক্তির উপায় কি? হাওড়া জেলার কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা বনবিহারী চক্রবর্তীর যোগ্য উত্তরসূরি সবুজ সেন বেছে নিল ভিন্ন ধারার রাজনীতি। নকশালপন্থী আন্দোলনের মূলস্রোতের সঙ্গেও সবুজ থাকতে পারে নি। পরবর্তীকালে কানু সান্যালের উদ্যোগে গঠিত সি ওয়াই এম এলের অন্তর্ভূক্ত হল সবুজ সেনের লিবারেশন ফ্রন্ট। নতুন যাত্রা শুরু।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সবুজ বনবিহারী চক্রবর্তীর মেয়েকে বিয়ে করে। এই নিয়ে আমাদের ইংরেজির আংশিক সময়ের অধ্যাপক, হাওড়া কোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী, অজিত দাস মজা করে বলতেন গুরুমারা বিদ্যে।

সত্তরের দশকের শেষ দিকে সবুজ 'মূর্তি ভাঙ্গার রাজনীতি - রামমোহন ও বিদ্যাসাগর' শীর্ষক পুস্তক লেখে অমল ঘোষ ছদ্মনামে। ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর 'Assassination of a tyrant' এবং মণ্ডল কমিশন নিয়ে লেখা বইয়ে সবুজের মার্কসবাদী চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। সবুজ সম্পাদনা করেছে 'মার্কসবাদের ভিত্তি', 'হাতুড়ি' এবং 'The Revolution' পত্রিকা।

নব্বইয়ের দশকে নকশালপন্থী আন্দোলনে ভাঁটার সময় সবুজ বেশি বেশি করে কলেজের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে। নরসিংহ দত্ত কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসেবেও সবুজ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে।

মতপার্থক্য তো হতই । আর মতপার্থক্য হলে, আমরা নিজের নিজের মতো অন্যান্যদের বোঝানোর চেষ্টা করতাম। বন্ধুদের কাছে যখন গিয়ে হাজির হতাম, তাঁরা বলত এই তো, সবুজদার সঙ্গে কথা হল। এখানেও সবুজ এগিয়েই ছিল।

শেষ দিকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও, রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত হতে সবুজ কখনোই পারে নি। সেই টানে বারবার ফিরেছে কাগজকলম নিয়ে। তখন আমাদের ফোনেই কথা হত। কত কিছু করার কথা বলত। একটা আকুতি ছিল সমাজ পরিবর্তন নিয়ে। শরীরে কুলোত না। সব শেষে সম্পাদনা করেছে 'নকশালবাড়ি আন্দোলনে ভিন্ন স্বর : দক্ষিণ ও বাম বিচ্যুতি বিরোধী ধারাগুলি' নামক তথ্যবহুল একটি বই। এই বইটির সম্পাদনার কাজে সবুজ ছাড়াও আছেন মিহির চক্রবর্তী, সুবোধ মিত্র এবং দীপঙ্কর রায়। সবুজ চলে যাওয়ার আগে বইটি দেখে যেতে পারল না ঠিকই, কিন্তু যে প্রতিকূল শারীরিক পরিস্থিতির মধ্যে এই বইয়ের কাজ সে করে গেল তা উদাহরণস্বরূপ হয়ে থাকবে সকলের কাছে। এই বইয়ে থাকবে সবুজের লেখা 'বাম হঠকারিতা থেকে নৈরাজ্যবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ।

খুব বেশি দিনের কথা নয়। আমাকে একদিন ফোন করে বলল, 'কিরে তুই নাকি আমাদের বইটা সম্পর্কে সমালোচনা করেছিস'। আমি বললাম 'তোদের বইটাতো আমি দেখিইনি, না দেখে কী করে সমালোচনা করব'। সবুজ চলে গেল, বইটা সম্পর্কে আর কিছু জানানো হল না। বাকি জীবনের জন্য এই আক্ষেপটুকু আমাদের বহন করে যেতে হবে।

হে বন্ধু বিদায়!

অধ্যাপক সবুজ সেন: একটি নীল রঙের ঘোড়া

মানস চৌধুরী

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

১

সবুজদার সঙ্গে আমার শেষ মুখোমুখি দেখা ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে নরসিংহ দত্ত কলেজে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের মিলনযজ্ঞে। বলা বাহুল্য, ঐ বছরে সেই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন অধ্যাপক সবুজ সেন। অসুস্থ শরীরেও অদম্য উৎসাহে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করে যেভাবে এই সমাবেশকে তিনি সংগঠিত করেছিলেন তার জন্য কোনো প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়। নিজেকে নিয়ে সংগত কারণেই সেদিন তিনি খুব খুশি ছিলেন। মধ্যাহ্নভোজনের পর আমার কাছ থেকে একটি সিগারেট চাইলেন। দেওয়া উচিত হবে না জেনেও দিলাম। একটু হাল্কা সতর্কবাণীও অবশ্য ছিল তার সঙ্গে। বললাম, হাঁপাচ্ছেন তবু চাই? এবার ছাড়ুন না। সবাই তো ছাড়লো। আপনি পারছেন না?

সবুজদা হাসতে হাসতে বললেন, আমি তুই দুজনেই জ্ঞানের পো। সকলের সঙ্গে তুলনা করে কী লাভ। আমাদের নিয়ম আলাদা। আমরা যখন ধরি সবটাই ধরি। যখন ছাড়ি সবটাই ছাড়ি। (সবুজদার পিতৃদেব ছিলেন এই কলেজের প্রাণপুরুষ প্রয়াত অধ্যাপক জ্ঞান সেন মহাশয় আর আমার পিতৃদেব ছিলেন অধুনা প্রয়াত জ্ঞান চৌধুরী মহাশয়। আমাদের এলাকায় তাঁর বিশাল কর্মকান্ড সম্পর্কে সবুজদা বিভিন্ন সূত্রে অনেক দিন থেকেই অবহিত ছিলেন।) আমি মুচকি হেসে বলেছিলাম, ধরাটা যতো সহজ, ছাড়াটা কি ততোটাই কঠিন নয় ? সবুজদা একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, এই দেখ না, শীগগিরই সব ছেড়ে দেবো। সময় হয়ে এসেছে।

২

সবুজদার সঙ্গে আমার শেষ কথা হয় টেলিফোনে গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন। প্রতি মাসেই অন্তত একবার করে আমাদের কথা হত। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চলত যতক্ষণ তাঁর শরীর দিত। ক্লান্ত হয়ে পড়লে নিজেই হঠাৎ 'রাখছি' বলে ফোনটা কেটে দিতেন। শেষের সেদিন কথা হচ্ছিল তাঁর একটি লেখা নিয়ে যেটি হয়তো শেষ পর্যন্ত অসমাপ্তই রয়ে গেলো। লেখাটি ছিল প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহের (Primitive Accumulation) সমস্যা বিষয়ক। মার্ক্স তাঁর মূল তাত্ত্বিক কাঠামোর বাইরে 'এশিয়াটিক মোড অব প্রোডাকশন'-এর কথা আলাদা ভাবে বলেছিলেন। ইউরোপের মতো এশিয়ার দেশগুলোতে রাষ্ট্র সমাজ থেকে যেহেতু একেবারে বিচ্ছিন্ন ও কোন বিমূর্ত সত্তা নয়, তাই এশিয়ার অনেক দেশেই এই প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহের দায়টি ঐতিহাসিকভাবে মূলত রাষ্ট্রকেই নিতে হয়েছে এবং সেই দায়টি পালন করতে হয়েছে সমাজের সর্বস্তরের সঙ্গে ব্যাপক সহযোগিতার ভিত্তিতে। যেখানে রাষ্ট্র একটি করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অন্ধভাবে উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমী উন্নয়নের মডেল গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে সেখানেই উন্নয়নের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে, সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে তৈরি হয়েছে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক পরিসর সংকুচিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত স্বৈরতন্ত্রের অভ্যুত্থান অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এই মার্ক্সীয় ভাবনাকে আশ্রয় করেই ভারতবর্ষের উন্নয়নের সমস্যার একটি নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছিলেন সবুজদা। এই মূল্যবান কাজটি যদি এখনও অসমাপ্ত অবস্থায় থেকে থাকে তবে আশু ভবিষ্যতে তাঁর কোনো যোগ্য উত্তরসূরি কাজটি সম্পূর্ণ করে তোলার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিলে সেটাই হবে তাঁর উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা।

৩

কলেজ থেকে আমার অবসর গ্রহণের পরে অন্তত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশবার তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আমি আমার ছাত্রজীবনে এক সবুজ সেনকে নামে চিনতাম যিনি নকশালপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে শুধু যে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তাই নয়, ঐ আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও ছিলেন। আশির দশকে অধ্যাপক সমিতির বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও অবস্থানগুলিতে অধ্যাপকদের ও সামগ্রিকভাবে দেশে এবং রাজ্যে উচ্চশিক্ষার সমস্যাগুলো নিয়ে তাঁর কিছু সারগর্ভ বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাত পরিচয় ঘটে নব্বইয়ের দশকে, বিদ্যানগর কলেজ থেকে এই কলেজে আসার পরে, তখন ধীরে ধীরে আবিষ্কার করলাম যে নেতৃত্ব ও বাগ্মিতা তাঁর সহজাত ক্ষমতার মধ্যেই পড়ে। অন্তত এই দুটি গুণ তাঁকে কোনোদিনই কষ্ট করে আয়ত্ত করতে হয়নি। তাঁর অনর্গল হিন্দী বক্তৃতা শোনারও সুযোগ আমার হয়েছে যা যে কোন বঙ্গসন্তানের পক্ষেই রীতিমতো ঈর্ষার বিষয়। এই কলেজে আমার কর্মজীবনের অন্তত প্রথম পনেরোটি বছর আমি দেখেছি শিক্ষকদের বসার ঘরটি সব সময় গমগম করছে। এখানে ওখানে বিভিন্ন টেবিলে হরেক বিষয় নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা, বিতর্ক, এমন প্রাণচঞ্চল পরিবেশে প্রাণিত হয়ে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষরাও প্রায়ই নিজেদের বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব দূর করতে একটু মুক্ত বাতাস গ্রহণ করবেন বলে এই আসরে যোগ দিতে চলে আসতেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এইসব আড্ডা থেকে অনেক কিছু শিখেছি যা অন্যত্র শিখে ওঠা সম্ভব ছিল না। শিক্ষক পরিষদের সভাগুলি ছিলো এতো বেশি নাটকীয় যে তাতে বিনোদন ও লোকশিক্ষা – দুটোর কোনটারই বিশেষ অভাব

ঘটত না। আর তাতে অবশ্যই অন্যতম মুখ্য চরিত্রে যাঁকে নিয়মিত পাওয়া যেত তাঁর নাম ছিল অধ্যাপক সবুজ সেন।

সবুজদা একদিন বললেন, কথা আছে তোর সঙ্গে। কলেজে হবে না। বাড়িতে আসিস। সমাজতন্ত্রের পতনের অর্থনৈতিক কারণগুলো তোর কাছে একটু বুঝতে হবে।

আমি সংকোচের সঙ্গে বলেছিলাম, আমিই বা এর কতটুকু বুঝি। সবুজদা কিছুটা স্নেহ মিশ্রিত ধমকের সুরে বললেন, আরে আমার থেকে তো বেশি বুঝিস। তোর বিষয় ওটা। তুই যা বুঝেছিস তাতেই আমার চলবে। একটি লেখা এই বিষয়ে আমাকে তৈরি করতে হবে। তোকে আমার দরকার। কলেজের পর একদিন একটু রাত করেই সবুজদার সঙ্গে তার কালী কুন্ডু লেনের বাড়িতে গেলাম। তখন আমি সান্ধ্য বিভাগে পড়াই বিশেষ চাপ কিছু ছিল না। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাঁর বাড়িতে গেলাম। প্রথমবার গিয়েছিলাম জ্ঞান সেন শতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে আমার উপর শিক্ষক পারিষদের চাপিয়ে দেওয়া একটা বিশেষ দায়িত্ব পালনের তাগিদে।

সবুজদা ততদিনে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অনেকটাই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। শিক্ষকতা, লেখালেখি, পত্রিকা সম্পাদনা এসবের মধ্যেই নিজেকে নিযুক্ত করেছেন বেশি। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখার কারণ হিসেবে তাঁর বক্তব্য ছিল খুব পরিষ্কার। বলতেন, যেদিন বুঝলাম শ্রেণীসংগ্রাম ব্যাপারটা ক্রমশই আমার নেশা ও পেশা হয়ে উঠছে সেদিনই ঠিক করে ফেললাম আর নয়। এর পরেও এসবের সঙ্গে বেশি জড়িয়ে থাকলে নিজের প্রতি সুবিচার হবে না। আর ওরকম একটা মারাত্মক ব্যাধি নিয়ে দেশ ও দশ কারোরই মঙ্গলসাধন করা সম্ভব নয়। এখন থেকে ভাবছি কলেজের জন্য আরো বেশি করে সময় দিতে হবে।

কলেজের জন্য এই বেশি করে সময় দেওয়াটা শেষ পর্যন্ত সত্যিই সবুজদার পক্ষে কতটা স্বাস্থ্যকর হয়েছিল সেটা তিনিই সবচেয়ে ভালো জানতেন আর অবশ্যই অনেকটা জানতেন বৌদি। ওঁর পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হলেও ও ব্যাপারে অবশ্য বৌদির সঙ্গে কখনো কোন বাক্যালাপের সুযোগ আমার হয়নি।

৪

আমার আরেকজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অগ্রজ অভিভাবকতুল্য বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন কাটোয়া কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক অধুনা প্রয়াত হিমাচল চক্রবর্তী। তিনি দীর্ঘদিনের শিক্ষক আন্দোলনের নেতা ছিলেন ও একসময়ে অধ্যাপক সমিতির সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। কলেজের অনেকেই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন এবং সকলেই তাঁকে বিশেষ সমীহ ও শ্রদ্ধা করতেন। সবুজদা ও হিমাচলদা পরস্পরকে নামে চিনতেন বটে কিন্তু বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল না। হয়তো ভিন্ন রাজনৈতিক পরিচিতির কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। হিমাচলদা মিখাইল গর্বাচভের ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন এবং পেরেস্ত্রয়কা ও গ্লাসনস্ত সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচিগুলি খুব শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে গভীরভাবে বোঝবার চেষ্টা করতেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে আমার মধ্যেও এই আগ্রহ তৈরি হয়। আমি সরাসরি সবুজদার সঙ্গে টেলিফোনে হিমাচলদার নতুনভাবে আলাপ করিয়ে দিই।

সবুজদাকে বলি, হিমাচলদা এই ব্যাপারে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল ও আপনার লেখাটি তৈরি করতে তাঁর থেকে আপনি অনেক সাহায্য ও প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তরফে হিমাচলদা ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত মহাশয় এই বিষয়টি নিয়ে তখন নিয়মিত চর্চা করছেন। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হলে সবুজদা নানাভাবে উপকৃত হতে পারেন। যদিও জানি এঁদের সঙ্গে সবুজদা মাঝে মাঝে বাক্যালাপ করেছেন তবু এতো আয়োজনে যে খুব একটা স্বস্তিবোধ করছিলেন না সে ইঙ্গিতও মাঝে মাঝে তিনি আমাকে দিতেন। আমি লেখাটির অগ্রগতি নিয়ে জানতে চাইলে একদিন আমাকে বললেন, যা বুঝলাম বিষয়টি নিয়ে তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই। অনেক সমস্যা ও জটিলতা আছে। আরো সময় দেওয়া দরকার। তবে এটা বুঝেছি সোভিয়েতের পতনকে সমাজতন্ত্রের পতন বলে লাভ নেই। তিরিশের দশকে মস্কো ট্রায়ালের সঙ্গে সঙ্গেই ওদেশের বিষয়টির বারোটা বেজে গেছে। ব্যবস্থটায় ধ্বস নেমেছে অনেক আগেই। শুধু দেশটি টুকরো হওয়া বাকি ছিল। সেটা ঘটল এই আশির দশকে।

তারপর হঠাৎ একদিন সবুজদা জিজ্ঞেস করলেন, তুই আমাকে অরওয়েলের 1984 পড়াতে পারিস?

সবুজদা জানতেন জর্জ অরওয়েল আমার খুব প্রিয় লেখক। তাঁর Animal Farm উপন্যাসকে ভিত্তি করে একটা নাটক লেখার কাজে হাত দিয়েছি তখন। সেই খসড়ার কিছু অংশ সবুজদাকে আমি পড়েও শুনিয়েছি। যতদূর জানি তাঁর খারাপ লাগেনি।

1984 বইটি সবুজদাকে দিয়েছিলাম পড়তে সবুজদা মাস তিনেক বাদে বইটি ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, সাবধানে থাকিস। বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং আস।

৫

আমরা একসময় 'অন্তর্বীজ' নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি মূলত সঞ্জীব ঘোষ (অধুনা প্রয়াত) ও অধ্যাপক কুন্তল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। আমি ছাড়া সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক তরুণ রায় ও অধ্যাপিকা বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার। প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অধ্যাপক চারুমোহন সরকার (অধুনা প্রয়াত)। পত্রিকাটি অবশ্য সাংগঠনিক কারণে বছর চারেক বাদে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সে অন্য কাহিনী। যেটি বলার সেটি হল, এই পত্রিকাটি নিয়ে সবুজদার ছিল বিপুল উৎসাহ। যদিও সেই সময়ে বাইপাস অপারেশনের পরে শারীরিকভাবে বেশ কিছুকাল অসুস্থ থাকায় খুব সক্রিয় ভাবে পত্রিকাটির সঙ্গে সবুজদা যুক্ত হতে পারেন নি। অরওয়েলের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত সেই পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় অরওয়েলের উপর আমার লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে সবুজদা যখন জানতে পারেন বলশেভিকবাদকে অরওয়েল ফ্যাসিবাদের মতোই একই রকম বিপজ্জনক মনে করতেন এবং এই দুটি আপাত বিরোধী মতাদর্শকে সেই তিরিশের দশকেই একই অপরাধে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন তখন একটি গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সবুজদার সেই স্বগতোক্তি এখনো আমার কানে বাজে – 'আচ্ছা, চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে যে সন্ত্রাস হয়েছিল অরওয়েল কি তার সাক্ষী ছিলেন? যদি থাকতেন তাহলে মাওবাদ সম্পর্কেও কি তাঁর অভিমত একইরকম হত?

৬

তখন কলেজের অধ্যক্ষ ড. বিমল দত্ত মহাশয়। প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। আশুতোষ কলেজ থেকে অধ্যক্ষ হিসাবে আমাদের কলেজে যোগ দিয়েছেন। থাকতেন হাওড়ার সালকিয়া। বামপন্থী মহলে খুব পরিচিত নাম। সবুজদা ও বিমলবাবু আগের থেকেই পরস্পরকে চিনতেন। উনি কলেজে যোগ দেওয়ার পরে সেই সম্পর্ক আরো গভীর হয়। তা বলে সেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে যে কোনো টানাপোড়েন ছিল না এমন নয়। কেননা দুজনে দু-ধারার বামপন্থী ছিলেন। মিলের থেকে অমিলই ছিল বেশি। তবু পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতার খুব একটা ঘাটতি ছিল এমনটি বলা যাবে না। অন্তত বাহ্যত নয়। সবুজদা ওঁকে নাম ধরেই ডাকতেন আর তুমি করে সম্বোধন করতেন। বিমলবাবু কিন্তু সকলকেই আপনি বলে সম্বোধন করতেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন যাঁরা খুব ঘনিষ্ট 'কমরেড' আর একদম তরুণ অধ্যাপকেরা যাঁরা সবে কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছে।

ওঁর কার্যকালে পুরো সময়টাই আমাকে হয় শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক হিসেবে নয় পরিচালনা সমিতিতে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে হয়েছে বলে আমাদের দুজনকে পরস্পরের সঙ্গে অন্তত একটা কাজ চালানো গোছের সম্পর্ক সব সময়ই বজায় রাখতে হত। কেননা শিক্ষক সম্প্রদায়ের মর্যাদা ও সামগ্রিকভাবে কলেজের স্বার্থের প্রশ্নে আমার স্পর্শকাতরতা ও অতিসক্রিয়তা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। সত্যি বলতে কি আমরা দুজনে কাছাকাছি এসেছি তাঁর কর্মজীবনের একেবারে শেষের দিনগুলোতে যখন তিনি এটা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন আমরা এতোদিন সত্যিই তাঁকে সাহায্যই করতে চেয়েছিলাম, তাঁর কাজে বিঘ্ন চাইনি। একদিন হাল্কা মেজাজে আড্ডাচ্ছলে তাঁর এই বোধোদয়ের জন্য ঘরে কয়েকজনের উপস্থিতিতেই বৌদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সবুজদা ছিলেন সেখানে। বললেন, বিমল, তুমি ডায়লেকটিক্স নিয়ে সর্বত্র বক্তৃতা করে বেড়াও, কিন্তু তোমার মিসেস তোমার থেকে এটা অনেক ভালো বোঝেন। তোমার বিভিন্ন কাজকর্মের যাঁরা ভুল ধরিয়ে দেন তাঁরাই যে তোমার আসল বন্ধু এই জ্ঞান কিন্তু ঘরের মহিলাদের একেবারে সহজাত। তুমি যাদের বিশ্বাসযোগ্য ও ঘনিষ্ঠ ভাবছ তারাই যে তোমার সম্ভাব্য শত্রু, এই মেকিয়ালেলিয়ন সতর্কবাণী কখনো বিস্মৃত হননি বলেই ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই বাহাত্তর বছর রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। যাঁরা বিস্তৃত হয়েছেন তাঁদের কারুর রাজত্বই কিন্তু দীর্ঘায়ু হয়নি।

বিমলবাবুর হয়তো মনে হয়েছিল সবুজদা এই সুযোগে তাঁকে একটু কটাক্ষ করার চেষ্টা করলেন। দুজনেই তো পুরনো খেলুড়ে। সুভাষদাকে বললেন সকলের জন্য মামুর ক্যান্টিন থেকে চা আনতে। তারপর সবুজদার দিকে তাকালেন। তাকিয়েই রইলেন বেশ কয়েক সেকেন্ড। সবুজদা বোধহয় ভেবেছিলেন, বিমলবাবুর চোখে তো গ্লুকোমার সমস্যা। দেখতে হয়তো অসুবিধে হচ্ছে। তাঁর চোখের সামনে হাত তুলে আঙ্গুল নাড়াতে নাড়াতে বললেন, দেখতে অসুবিধে হচ্ছে? বলতো কটা আঙ্গুল? একটা না দুটো?

বিমলবাবুর একমুখ দাড়ি। দাঁড়ির ফাঁক দিয়ে একটু মুচকি হাসলেন তিনি। গলা খাঁকারি দিলেন বারকয়েক। তারপর বললেন, সবুজবাবু, আমার যে সমস্যার কথা আপনি বললেন সেগুলো কিন্তু আপনারো সমস্যা। আপনিও আমার মতো কানে দেখেন। নইলে আপনার তো আরো অনেক উপরে ওঠার কথা। আমি না হয় চোখে ভালো দেখতে পাই না। তাই কান দিয়ে সেটা কিছুটা পুষিয়ে নিতে হয়। আপনার তো সে সমস্যা নেই। তবে?

সবুজদা বোধহয় এরকম একটা ইয়র্কারের জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। তবু নেহাতই কিছুটা রিফ্লিক্সে ব্যাট নেমে এলো ক্রীজে। হো হো করে হেসে বেপরোয়া চেষ্টা করলেন ব্লক করতে। বললেন, জানো তো, আমার মূল সমস্যা হৃদয়ে। সেখানে ব্লকেজ ছিলো বলেই তো চোখে নাকের মধ্যে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, অপারেশনের পরে এখন আবার সব যে যার জায়গায়। ভেবো না, এখন আমি যেমন রাঁধি, তেমন চুলও বাঁধি। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার এই গোপন ডায়লেকটিক্সের খবর এই ছোঁড়াগুলো কিছুটা জানে। কিছুদিন কাটাও এদের সঙ্গে। তুমিও সব জেনে যাবে।

খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বাক্যালাপের অল্প কিছুদিন পরেই অধ্যক্ষ তাঁর নিজের ঘরে একটি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে সভা চলাকালীন অকস্মাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

সেই সভায় আমার থাকার কথা ছিল। উনি বারবার আমাকে অনুরোধ করেছিলেন থাকার জন্য। বলেছিলাম, অবশ্যই চেষ্টা করবো। বলেছিলেন, একটু দেরি হলেও আসবেন। আপনার, কুন্তলবাবুর থাকাটা খুব দরকার। এর আগে কখনো বিমলবাবু এভাবে কোনো অনুরোধ করেননি। বেশ অসহায় মনে হয়েছিল তাঁকে। কথা দিয়েছিলাম, ভাববেন না, ঠিক আসবো, দেরি হলেও। কিন্তু একটা বিশেষ পারিবারিক কাজে অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় কথাটা রাখতে দেরিটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। যখন কলেজে পৌঁছলাম, ততক্ষণে সব শেষ।

স্টাফ রুমে শিক্ষকদের বসার ঘরে দেখি কয়েকজন শিক্ষক বসে আছেন। সকলেই নীরব, শোকস্তব্ধ। সবুজদাও ছিলেন সেখানে। আমি গিয়ে পাশে বসলাম। সবুজদা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করলেন, আজকের এই দিনটি নরসিংহ দত্ত কলেজের অন্ধকারতম দিন।

৭

কলেজ সার্ভিস কমিশনের চিঠি আমার হাতে পৌঁছোনোর আগেই কলেজে পৌঁছে গিয়েছিল। একদিন খুব সকালে তিমিরদা, কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক তিমির বরণ চক্রবর্তী, আমাদের প্রতিবেশী ও পারিবারিক বন্ধু, এলেন বাড়িতে। জানালেন সংবাদটি। খাঁটি বাঙাল। বললেন, শোন, এর থিকা ভালো খবর কিছু হয় না। এই কলেজটা হইতাছে টিচার্স প্যারাডাইস। দেখবি, একবার আইলে আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা করবে না। তাড়াতাড়ি জয়েন কর। সান্ধ্যবিভাগ বলে একটু গাইগুই করছিলাম। তিমিরদা বললেন, আরে তাতে কি? এইখানে সবাই সান্ধ্যবিভাগেই আসে। তারপর দিনে ফাঁকা হইলে সে সেকশনে চইলা যায়। বছর দুই তিন ইভিনিং সেকশনে থাক। তারপর তোগো নীলিমবাবু (অধ্যাপক নীলিম মিত্র) রিটায়ার করলে চইলা আসবি দিনের বেলায়।

ছেলেবেলা থেকেই কলেজটির নাম জানতাম। খুবই সুনাম শুনেছি কলেজটির। আমাদের এলাকার অনেক ছেলেমেয়েই এই কলেজে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রী ছিল। এই কলেজের বেশ কয়েকজন অধ্যাপক আমাদেরই এলাকার বাসিন্দা। ছেলেবেলা থেকেই তাঁদের সকলের সঙ্গে আমার পরিচয়। অধ্যাপক জগদিন্দু নারায়ণ ভট্টাচার্য জয়পুরিয়া কলেজে পূর্ণ সময়ের ও বহুদিন এই কলেজে আংশিক সময়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনিও আমাদের পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। ফলে সব মিলিয়ে এই সংবাদে আমার অখুশি হওয়ার কিছু ছিল না। শুধু সান্ধ্য বিভাগটুকু ছাড়া। মানে আমার অন্যান্য সখ-আহ্লাদের একেবারে বারোটা বাজতে চলল আর কি।

কিন্তু কলেজে যখন এলাম দেখলাম নবরসে চারদিক একেবারে টইটম্বুর। লেখাপড়া, আড্ডা, বিনোদন, খেলাধূলো, বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মেতে আছে একটা প্রতিষ্ঠান যার সঙ্গে যুক্ত হতে পারাটা যে কোনো শিক্ষকের পক্ষে নিতান্তই সৌভাগ্যের ব্যাপার। তিমিরদা যে বলেছিলেন কলেজটা টিচার্স প্যারাডাইস, একবর্ণও বাড়িয়ে বলেননি। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন গণিতের অধ্যাপক কেশব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। প্রথমদিন তাঁর ঘরে যখন ঢুকলাম রিপোর্ট করার জন্য তখন ঘরভর্তি লোক। অধ্যক্ষের সামনে বসে অন্তত জনা দশ-পনেরো অধ্যাপক। বোধহয় কোনো মিটিং হচ্ছিল। ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইতেই অধ্যক্ষ একবার চাইলেন আমার দিকে। তারপর সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে ডেকে নিলেন আমাকে। একটি ফাঁকা চেয়ার ছিল। সেখানে বসতে বললেন।

মুচকি হেসে বললেন, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। তিমিরবাবু বলছিলেন আপনি আসবেন আজ।

তারপর উপস্থিত সকলের সঙ্গে একে একে আলাপ করিয়ে দিলেন। সেখানেই প্রথম পরিচয় সবুজদার সঙ্গে। সেই মুহূর্তে সবুজদার চোখেমুখে আমার জন্য যতোটা ভদ্রতা ছিল, ততোটা আপ্যায়নের ছাপ ছিল না। থাকলেও আমার চোখে অন্তত সেদিন সেটি সেভাবে ধরা পড়েনি।

একটু দূরত্বে একজন অধ্যাপক একটি চেয়ারে বসে মনোযোগের সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা কাজ করছিলেন। তাঁর সামনের টেবিলের উপর ঢাই করে রাখা কিছু ফাইলপত্তর। এতো কথাবার্তায় তাঁর মনোযোগে বিঘ্ন ঘটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাঁকে দেখে সেরকম কিছু মনে হল না। কেশববাবু ডাকলেন ওঁকে। আমাকে বললেন, পার্থবাবু, অধ্যাপক পার্থ সেন। আমি হাতজোড় করে নমস্কার করলাম। পার্থবাবুও আমাকে সৌজন্যমূলক একটি হাসি হেসে প্রতি নমস্কার জানিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁর নিজের কাজে।

অনেকের মধ্যে আরেকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে গিয়ে অধ্যক্ষ মহাশয় বললেন, ইনি অধ্যাপক সত্যরঞ্জন দাস (অধুনা প্রয়াত)। ইনি আপনার পুরোনো কলেজে কিছুদিন অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে আবার এখানে ফিরে এসেছেন। আমি হাতজোড় করে নমস্কার করলাম। বললাম, আপনার কথা অনেক শুনেছি ওখানে। সত্যদা মৃদু হাসলেন আমার দিকে চেয়ে। বললেন, পবিত্র (কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়) বলছিল একটা ভালো ছেলেকে আপনারা নিয়ে নিলেন, ঠিক করলেন না। আমি অবশ্য বলেছি না নিয়ে উপায় কি ? তোমার পাল্লায় পড়ে ওর বারোটা বাজুক এটাই কি চাও তুমি? পবিত্র কি কম যায়? হাসতে হাসতে বলল, চেষ্টা করে দেখুন ওর গোল্লায় যাওয়া আপনি আটকাতে পারেন কিনা। বলে নিজেই হেসে উঠলেন। সামান্য উচ্চকিত সেই হাসি। দুই সেন সুলভ উন্নাসিকতার মাঝখানে সত্যদার এই রসবোধ ছিল আমার কাছে একঝলক মুক্ত বাতাসের মতো। প্রথম আলাপেই স্পষ্ট করে দিলেন কেন তিনি সকলের এতো শ্রদ্ধাভাজন। স্নেহ, প্রশ্রয় ও শাসন কোনোটাতেই তাঁর কোনো কার্পণ্য নেই। একারণেই হয়তো সর্বত্রই সকলে তাঁকে যথার্থ অভিভাবক হিসেবে মান্যতা দিতেন।

অধ্যক্ষের অনুরোধক্রমে অমরদা, অধ্যাপক অমরকৃষ্ণ দত্ত, সান্ধ্য বিভাগে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান (অধুনা প্রয়াত) আমাকে শিক্ষকদের বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন উপস্থিত সকলের সঙ্গে। আমার বিভাগীয় সহকর্মীরা প্রায় সকলেই ছিলেন। একটু একটু করে আমার অস্বস্তি কাটছিল। অনেকটাই কাটল যখন অমরদা বললেন, শোন আমি কিন্তু ছোটোদের সকলকেই তুই বলে সম্বোধন করি। আর ওদের সকলের কাছে আমি দাদা। আজ তোর প্রথম দিন। তোর চা সিগারেটের খরচা আমার। কালকে কিন্তু পুষিয়ে দিতে হবে। মনে থাকে যেন। আসলটা পেলেই হবে, সুদ চাই না।

এই 'আগন্তুক' অবস্থা কাটতে অবশ্য আরও বেশ কিছুদিন সময় লাগল আমার। সমস্ত ঠিকুজি-কুষ্ঠি ঘেঁটে বিভিন্ন মহল যখন নিশ্চিন্ত হলেন যে আমার অতীত কার্যকলাপে তেমন সন্দেহজনক বা বিপজ্জনক কিছু নেই বা বিভিন্ন রকম যোগ্যতার প্রশ্নেও একেবারে ফেলনা বলা যাবে না তখন একটু একটু করে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। স্বর্গের বৈধ নাগরিক হয়ে উঠতে একটু-আধটু কাঠখড় তো পোড়াতেই হবে। তবে আমার তো মাঝেমাঝেই ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার অভ্যেস। সেটা অনেকের ভালো না লাগুক অধ্যাপক সবুজ সেনের যে খারাপ লাগেনি সেটা বুঝতে পেরেছিলাম যখন কলেজে যোগ দেওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই কলেজের কাউকে না জানিয়ে বরোদা চলে যাই AIFUCTO-র বার্ষিক সভায় অধ্যাপক সমিতির তরফে একটি বিশেষ বামপন্থী সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে। ফিরে এসে শিক্ষক পরিষদের সভায় যখন আমার এই অভিজ্ঞতা সহকর্মীদের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করি তখন আমার এইভাবে যাওয়াটা কতদূর সংগত হয়েছিল এই নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন। সবুজদাই উঠে দাঁড়িয়ে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন শিক্ষক পরিষদের উচিত হবে এই নিয়ে অযথা বিতর্ক না করে সেই অভিজ্ঞতাগুলো গুরুত্ব দিয়ে শোনা এবং প্রথামাফিক আমার যাতায়াত খরচের ব্যয় বহন করা। আমিই তা গ্রহণ করতে আপত্তি জানাই কেননা আমার ওখানে প্রতিনিধিত্বের জন্য পরিষদের যে প্রাক-অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল তা নেওয়া হয়নি এবং বরোদায় আমি নিজের দায়িত্বেই গিয়েছিলাম, কলেজের হয়ে যাইনি। সুতরাং সবুজদার প্রস্তাবে শিক্ষক পরিষদ নিমরাজি গোছের সম্মতি জানালেও আমার প্রবল আপত্তিতে ব্যাপারটা আর বেশি দূর গড়াতে পারেনি। কিন্তু তারপর থেকে সবুজদার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দাদা-ভাই-এর সম্পর্কের মতো অনেকটাই সহজ হয়ে এল। পরবর্তীকালে জ্ঞান সেন শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে অনেকের সঙ্গে আমিও যে খুব সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলাম সেটা মূলত সম্ভব হয়েছিল সবুজদার সঙ্গে আমার নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে।

৮

অধ্যাপক সবুজ সেন যে অত্যন্ত উদ্যমী মানুষ ছিলেন এটা স্বীকার করতে তাঁর সহকর্মীরা বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কেউই যে কার্পণ্য করবেন না এটা একেবারে নিশ্চিত। আমি শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক থাকাকালীন শিক্ষক পরিষদের কতিপয় সদস্যের উদ্যোগে লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে একটি মামলা করা হয়। শিক্ষকদের উপর অযৌক্তিকভাবে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই এই মামলা। আমার যতোটুকু জানা আছে সারা পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ এই কলেজই প্রথম নিয়েছিল এবং সেটা অবশ্যই সম্ভব হয়েছিল সবুজদা, পার্থদা, সঞ্জীবদা, সন্দিদা, অনিমেষদা, দিলীপদা, সাধনদা, কুন্তল প্রমুখদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায়। তাৎক্ষণিকভাবে সেই মামলার বিশেষ সুফল আমরা

না পেলেও মহামান্য আদালত আমাদের উত্থাপিত বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করায় পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে কমিশনকে নৈতিকভাবে কিছুটা সতর্ক থাকতে আদালত বাধ্য করতে পেরেছিলেন। এই রায়ের সুফল এ বিষয়ে অন্যান্য মামলাকারীরা এখনও যে পেতে পারেন এটাই হচ্ছে এই প্রচেষ্টার সবচেয়ে ইতিবাচক দিক।

কলেজে প্রথম NAAC পরিদর্শনের সময় IQAC-র কো-অর্ডিনেটর হিসেবে সবুজদাকে যে ভূমিকায় দেখেছি সেটা ভোলবার নয়। ঐ ভূমিকার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সকলেরই তাঁর কাছে নতমস্তক থাকা উচিত। স্বর্গ-নরক সব সৃষ্টির কারিগর তো আমরা নিজেরাই। এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই এই প্রতিষ্ঠান যখন শ্রীহীন হতে আরম্ভ করে তখন আমরা অনেকে হয় সক্রিয়ভাবে এই অধঃপতনকে ত্বরান্বিত করেছি, নয় তাকে রোধ করতে যথেষ্ট সচেষ্ট হতে পারিনি কিংবা শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকায় থেকে যাওয়াটাই শ্রেয় মনে করেছি। সেই দুর্যোগে সবুজদার নেতৃত্ব ছাড়া শিক্ষক পরিষদের পক্ষে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ানো আদৌ সম্ভব ছিল বলে আমার মনে হয় না।

৯

সকলেই জানেন প্রদীপের নীচেই সবচেয়ে নিবিড়, ঘন অন্ধকার। তাই আমাদের চরম আত্মসন্তুষ্টির দিনগুলোতে সর্বত্রই গোপনে গোপনে বেড়ে উঠেছিল সেই ব্যাধি যা একবার শিকড়ে পৌঁছে গেলে স্বয়ং ঈশ্বরও বাধ্য হন শয়তানের কাছে নতজানু হতে। ঠিক একদিন যেভাবে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল সেইভাবে ধীরে ধীরে অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো এই প্রতিষ্ঠানও তলিয়ে যেতে শুরু করল ক্ষমতার কৃষ্ণগহ্বরে। এর জন্য রাজ্য, জেলা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন চোরাস্রোতের তীব্র সংঘাত মূলত দায়ী যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমশই আরো তীব্রতা ও বিস্তৃতিলাভ করেছে। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে এই প্রতিষ্ঠানে অতীতে যতোটুকু প্রতিরোধ ছিল তাও বিচক্ষণ প্রবীণ শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এক সময় ভেঙে পড়তে শুরু করে বলা চলে এই শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রায় শুরু থেকেই। তাই বছরের পর বছর চেষ্টা চলে NAAC এর পরিদর্শন এড়িয়ে যাওয়ার। পরে যখন এটা উপলব্ধিতে এল যে এটি না হলে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিশেষত আর্থিক কারণে সত্যি সত্যিই বিপন্ন হতে চলেছে, তখন এ ব্যাপারে প্রস্তুতি শুরু হয় মূলত সবুজ সেনের নেতৃত্বেই। একেবারে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে অসুস্থ শরীরেও যথার্থ সেনাধ্যক্ষের মতো যেভাবে অল্প কিছুদিনের প্রস্তুতিতে অসম্ভব পরিশ্রম করে সকলকে সঙ্গে নিয়ে এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত করেছিলেন তার জন্য সবুজদার কাছে এই প্রতিষ্ঠানের সকলেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এই মহাবিদ্যালয়ে আমার প্রায় ছাব্বিশ বছরের কর্মজীবনে সবুজদার সাংগঠনিক ক্ষমতার বহু পরিচয় আমরা পেয়েছি কিন্তু সংগঠক হিসেবে তিনি যে অবিকল্প, যে কোন উচ্চমানের পেশাদার ইভেন্ট ম্যানেজারের সমতুল্য, এই পরিচয়টি আমরা পেলাম প্রথম NAAC পরিদর্শনের সময়। একটি প্রতিষ্ঠানকে কতোটা ভালোবাসলে ও পরমাত্মীয় জ্ঞান করলে এটা সম্ভব সেটা আমাদের পাটোয়ারি বুদ্ধিতে সহজে বোধগম্য হওয়া কঠিন। এই আবেগটি হয়তো উত্তরাধিকার সূত্রেই তিনি পেয়েছিলেন যার যথার্থ মর্যাদা আমরাও অনেকে সব সময় দিতে পারিনি। খুব সম্ভবত সেই আবেগ থেকেই হয়তো এই ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠানের একটি বিশ্বস্ত ইতিহাস রচনার তাগিদ তিনি তীব্রভাবে অনুভব করতেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অসুস্থতা ও অন্যান্য ব্যস্ততার মধ্যেও এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। যদিও বিভিন্ন কারণেই এই কাজটি তাঁর পক্ষে শেষ করে যাওয়া সম্ভব হয়নি তবু এটা তো ঠিক, ইতিহাস একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং সব সময়ই তা অসম্পূর্ণ থাকে। তাই যতটুকু করে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে সেটুকুও যদি একটু সম্পাদনা ও পরিমার্জনা করে প্রকাশ করা সম্ভব হয় তবে সেটাই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে পবিত্র ও মূল্যবান শ্রদ্ধার্ঘ্য। লোকে তো অন্তত এইটুকু জানবে এইখানে গঙ্গার পশ্চিমকূলে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে একদা যাকে সকলে গর্বের সঙ্গে বলতো 'হাওড়ার প্রেসিডেন্সি'....

১০

সবুজদাকে নিয়ে বলতে গেলে আরো অনেক কথা, অনেক স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। সত্যি বলতে কি একটি উত্তরাধুনিক উপন্যাস বা নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠার সব উপাদানই সবুজদার ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল। কিন্তু এখানে এই স্বল্প পরিসরে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।

কেন বলছি এ কথা তার একটি সংগত কারণ আছে। সবুজদা তাঁর অভ্যাস ও সংস্কারবশত গৃহবন্দী অবস্থাতেও সব সময়ই সমগ্র বিশ্ব, দেশ, সভ্যতার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইত্যাদি জটিল বিষয় নিয়ে খুব ভাবতেন। বলতাম, এতো ভাববেন না। কি হবে ভেবে? আপনার উপর নেই ভুবনের ভার।

ফোনেই খুব জোরে হো হো করে হেসে উঠতেন মানুষটি। সেই প্রাণবন্ত হাসি যার স্পর্শে চিরনিদ্রিতও হয়তো স্বপ্নের মধ্যে জেগে উঠবে। বলতেন, আরে ভাবছি কোথায় রে? সে ক্ষমতা আছে নাকি? ছেলেবেলা থেকে শুধু তো ভাবা প্র্যাকটিসই করছি। ওটাই তো আমার একমাত্র কাজ। এই প্র্যাকটিসটা বন্ধ হয়ে গেলে জানবি তোর সবুজদার ইন্তেকাল উপস্থিত। শোন, আমি তো তেমন কেউকেটা কেউ নই। তবু আমার একটা এপিটাফ আছে। খুব ব্যক্তিগত। তোর বৌদি আর আমার দুটি কন্যার জন্য। শুধু তোকেই শোনাচ্ছি। খুবই কনফিডেনশিয়াল। এ প্রান্তে তখন রিসিভারের উপর আমার নিজেরই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ যেন ঢেউ হয়ে নিঃশব্দে আছড়ে পড়ছে। 'এইখানে একদিন অত্যন্ত ছাপোষা অস্থিরচিত্তের কেউ একজন ছিল যে কখনো তেমন মহৎ কিছু করতে না পারুক, অন্তত সততার সঙ্গে চিরকাল ভাবা প্র্যাকটিস করে গেছে'।

১১

এই অবিশুদ্ধ, বহুমাত্রিক, বর্ণময়, অস্থি-মজ্জায় অস্তিত্বের দ্বান্দ্বিকতায় বিশ্বাসী মানুষটি সম্পর্কে যে কথাটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় তা হোল কেউ কখনো সদ্যপ্রয়াত অধ্যাপক সবুজ সেনের মগজে তাঁর জীবদ্দশায় হাজার চেষ্টা করেও কারফিউ জারি করতে পারে নি। বিপজ্জনকভাবে বাঁচাটাই সর্বদা তাঁর বেশি পছন্দের ছিল। রসায়নশাস্ত্রে তাঁর কোন কেতাবি বুৎপত্তি না থাকলেও তাঁর নিজস্ব গোপন ল্যাবরেটরিতে নিজস্ব পদ্ধতিতে সমস্ত বিপরীতের যে চমৎকার ককটেল তিনি তৈরি করতেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর। তিনি বিশ্বাস করতেন শুধু ব্যাঙ কেটে কেউ মানুষ হতে পারে না কিন্তু অনায়াসে মানুষ কেটে যারা গর্বের সঙ্গে ব্যাঙাচি হতে চাইত তাদেরও কখনো দূরে ঠেলে দেন নি। ন্যায়-অন্যায় বোধ তাঁর তীক্ষ্ণ ছিল কিন্তু যেমন খাদহীন সোনা ব্যবহার্য নয় তেমনি বাস্তব জীবনে নিখাদ ভালোমানুষের কার্যকারিতা নিয়ে আজীবন তাঁর কিছুটা সংশয় ছিল। তাঁর প্রথম যৌবনের রাজনীতির প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা থেকেই এই সংশয় তৈরি হয়েছিল কিনা কে জানে। সমতলে থেকেও পাকদন্ডী পাহাড়ি পথে বেপরোয়া চড়াই-উৎরাই তাঁর কাছে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর মনে হত। স্বাধীন আরোহণ-অবরোহণ ছিল সবচেয়ে প্রিয় খেলা। জীবনকে ভালোবাসতেন, তাই অমৃতের প্রতি এক ধরনের টান তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু বেশি পছন্দ করতেন তার সঙ্গে একটু বিষ মিশিয়ে দিতে কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন দু-এক ফোঁটা বিষপান করলে অমৃতের মধ্যে যে সমস্ত অদৃশ্য আততায়ী ভাইরাসগুলো আত্মগোপন করে থাকে সেগুলোর অন্তর্ঘাতী প্রবণতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। শেষ পর্যন্ত এই নিরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছিলেন কিনা, হলেও কতটা সে প্রশ্নটি আজ হঠাৎ আকস্মিক ভাবে একেবারেই কালের গহ্বরে। এখন তিনি সব অর্থেই আমাদের সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কে জানে এখনো হয়তো তিনি স্বভাবদোষে গ্রহান্তরের নতুন ঠিকানায় ছটফট করছেন, এখানে আমাদের টিঁকে থাকাকে নির্বাধ করার তাগিদে নতুন কোনো অদৃশ্য ঘাতকের মোকাবিলায় বিনিদ্র কাটাচ্ছেন। তাঁর প্রতি একান্ত বিনীত নিবেদন, এতো ভাববেন না আমাদের নিয়ে। এবার একটু শান্তিতে বিশ্রাম নিন। আমাদের একটু শিরদাঁড়া সোজা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করুন। আশীর্বাদ করুন যাতে আমরাও আপনার মতো, আর কিছু না হোক, অন্তত ভাবাটা একটু প্র্যাকটিস করতে পারি।

১২

আমার চোখে আসলে একটা প্যাশনের নাম হোল সবুজ সেন। সবুজদা প্রায়ই বলতেন, 'চেতনার সঙ্গে হৃদয়ের মেলবন্ধন না ঘটলে চৈতন্য আসে না। আর সেটা না এলে যথার্থ সমাজতন্ত্রী হওয়া যায় না। অনেক হৃদয়হীন মানুষ আমি দেখেছি যারা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে দাবী করত। শুধু এখানে নয়, সারা বিশ্বজুড়েই'। তাঁকে যতোই দেখেছি ততোই মনে হয়েছে তিনি হয়তো চেয়েছিলেন এই ওরাংওটাংদের জগতে চিৎপটাং ইট-পাটকেলের ভিড়ে হাঁসজারু না হয়ে একটি নীল রঙের ঘোড়া হতে যার চোখ, কান, নাক, মুখ দিয়ে কেবল আগুন ঝরবে, যে আগুন সব আবর্জনা পোড়াতে পোড়াতে একসময় নিজেকেও পোড়াবে, নিজেকে আরো, আরো বেশি শুদ্ধ করবে। যদি তাই চেয়ে থাকেন তবে একথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যেতে পারে, তাঁর এই দীর্ঘ অস্থির ঐহিক পরিক্রমা একেবারে বিফলে যায় নি। আমাদের এতোদিনের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশি দূষিত করেছে আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়কে। কে না জানে এই অতি স্পর্শকাতর ইন্দ্রিয়টি শুদ্ধ হলে তবেই তো শুদ্ধ হয় আমাদের দর্শন, আমাদের বচন, আমাদের মনন ও আত্মা।

সে আমরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি বা নাই করি কিছুই যায় আসে না।

আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি না সবুজদা

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

'একজন দীর্ঘ লোক সামনে থেকে চলে গেলো দূরে'। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি অসামান্য এলেজির প্রথম লাইন। সবুজদার চলে যাওয়া আমার কাছে অনেকটা এরকমই। অজ্ঞাত অতিমারির দ্বিতীয় প্রবাহে আমাদের সামনে থেকে, ঠিকঠাক বললে, মুঠোফোনের ওপাশ থেকে (প্রায় বছর দেড়েক ধরে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ তো ঐ মুঠোফোনেই) সবুজদা চলে গেলেন, 'দিগন্তের দিকে মুখ'। আর এক 'প্রবাহ', নরসিংহ দত্ত কলেজের এই বার্ষিক পত্রিকা, তার দ্বিতীয় সংখ্যায়, অর্থাৎ আর এক দ্বিতীয় প্রবাহে, তাঁকে মনে করতে গিয়ে যেন দেখতে পাচ্ছি এক দীপ্যমান মানুষের মুখ। টুপি খুলে মাথানিচু বলতেই হচ্ছে 'যে যায় সে দীর্ঘ যায়, থাকা মানে সীমাবদ্ধ থাকা'। দীপ্যমান তো বটেই সে মুখ যে 'আশা দেয়, ভাষা দেয়, অধিকন্তু, স্বপ্ন দেয় ঘোর'। অধ্যাপক সবুজ সেন আমার মতো অনেককে প্রায় চার দশকের সাহচর্যে এসবই দিয়েছিলেন।

১৯৮২-তে আমার কলেজে যোগ দেওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই চা-সিগারেট আর তর্ক-বিতর্কের জমাটি আড্ডায় আরও অনেকের মতোই বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল সবুজদার সঙ্গে। বয়সে অনেকটাই বড়ো, শিক্ষক হিসেবে কৃতবিদ্য, সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যক্রমে সোচ্চার, কখনো বা বিতর্কিত সংবাদ শিরোনামে। সেভাবে দেখলে অধ্যাপক সবুজ সেনের সঙ্গে বেশ কিছুটা সসম্ভ্রম দূরত্বেই দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল আমার। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি অসমবন্ধুত্ব স্থাপনের চৌম্বকশক্তি ছিলো সবুজদার স্বভাবে। তাঁর ঝকঝকে স্মার্টনেস, দুচোখের ধারালো দৃষ্টি, চমৎকার কথা বলার ভঙ্গি, ভারী বিষয় আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে দু-এক টুকরো চটুল রসিকতা বা অ্যানেকডোট, স্টাফ রুমের টেবল-টক আর ক্যারমের আসরকে টেনে নিয়ে যেত কতো বিকেল পেরিয়ে সন্ধে, আর সন্ধে গড়িয়ে রাতে। শিক্ষক পরিষদের সভার বিতর্ক-বিতণ্ডায়, কলেজের নানাবিধ কর্মকাণ্ডে এক সক্রিয় ও সাবলীল বৌদ্ধিক অস্মিতায় আমার মতো অনেককেই মুগ্ধ করতে সবুজদার জুড়ি ছিল না।

১৯৮২ থেকে পঁচিশ বছরেরও বেশি অগ্রজপ্রতিম বন্ধু সবুজ সেন, সহকর্মী অধ্যাপক সবুজ সেন, উপাধ্যক্ষ সবুজ সেন, ন্যাক কমিটির কো-অর্ডিনেটর সবুজ সেন ইত্যাদি নানা ভূমিকায় সবুজদার সঙ্গে কলেজের নানা কাজে যুক্ত থেকেছি। এই কলেজের প্রতি তাঁর ভালোবাসার শরিক হয়ে আমিও আরও অনেকের মতো জড়িয়ে গেছি সবুজদার পিতৃদেব অধ্যক্ষ জ্ঞান সেনের স্মৃতি-বিজড়িত নরসিংহ দত্ত কলেজের ভালোমন্দের সঙ্গে। আসলে ছোটো-বড়ো নানা কাজে নিজেকে জড়িয়ে নিতে আর সতীর্থদের জড়িয়ে রাখতে জানতেন সবুজদা। কথা বলার উৎসাহ ও কাজ করার উদ্দীপনায় আমার মতো তরুণতর সঙ্গীসাথীদের পেছনে ফেলে সর্বদাই সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে পড়তেন, হাল ধরে থাকতেন স্পর্ধিত একাগ্রতায়। দীর্ঘদিন প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে অর্জিত সাংগঠনিক দক্ষতা, কঠিন পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে বিরোধ-বিপর্যয়ের মোকাবিলার মনোবল আর সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী শক্তি, এ-সব নিয়েই চলতো সবুজের অভিযান। সর্বভারতীয় রাজনীতির পরিসর ছেড়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি তাঁর একান্ত আপন নরসিংহ দত্ত কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে যোগ দিয়েছিলেন প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের শরিক হতে। সেটা সম্ভবত ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিক। সবসময়ই কিছু করার একটা তাড়না; আলোচনা-সভা, বক্তৃতা-বিতর্ক-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, কলেজ ক্যাম্পাসে শৃঙ্খলা রক্ষায় নজরদারি, যা-হোক কিছু মূল্যবান সক্রিয়তা; সবুজদাকে সচল সপ্রতিভ করে রাখত। তিনি ক্লান্ত হতে চাইতেন না বলে আমরাও ক্লান্ত বোধ করার সুযোগ পেতাম না। আমাদের আলাপ-আলোচনা-আড্ডা প্রায়ই কলেজের চৌহদ্দি পেরিয়ে পৌঁছে যেত জ্ঞানবাবুর কালী কুণ্ডু লেনের শতাব্দী-প্রাচীন বাড়ির বৈঠকখানায়। হাসিমুখে চা-জলখাবার যোগান দিতেন বৌদি। মাঝে মাঝে এসে পড়ত সবুজদার দুই মেয়ে; অমৃতা ও অসিতা। স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকে বৌদি আর মেয়েদের দেখিয়ে বলতেন, 'এই তো আমি আর আমার তিন মেয়ে।' সক্রিয় চিন্তা ও গুরুভার কর্মকাণ্ডের মানুষেরা অধিকাংশই গম্ভীর ও রাশভারি হয়ে থাকেন। সবুজদা ছিলেন একেবারেই ব্যতিক্রম, দারণ মজার মানুষ, বৈঠকী ও পরিহাসপ্রিয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অন্যতম প্রিয় ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন নরসিংহ দত্ত কলেজের প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৯২৪ থেকে ১৯৬০, দীর্ঘ ছত্রিশ বছর, প্রথমে উপাধ্যক্ষ ও পরে অধ্যক্ষ হিসেবে সযত্ন লালনে চারাগাছটিকে দিয়েছিলেন মহীরুহের মর্যাদা। সভা-সমিতি-আড্ডায় তাঁর স্মৃতিরোমন্থনে সবুজদা সংযত শ্রদ্ধায় বলতেন রসায়নের কৃতী ছাত্র ও যশস্বী শিক্ষক জ্ঞান সেনের কথা, স্মরণ করতেন কলেজের প্রকৃত রূপকার অধ্যক্ষ জ্ঞান সেনের অবদান। খানিক নেপথ্যে থেকে শ্রমনিষ্ঠ পরিকল্পনায় ১৯৯৪-৯৫ সালে সেই রূপকারের শতবার্ষিকী উদযাপনে সবুজদার ভূমিকা ছিল দক্ষ ও মেধাবী সংগঠকের। দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা জ্ঞানবাবুর ছাত্র-পরিজন-গুণগ্রাহী, কলেজের পূর্বতন ও কর্মরত শিক্ষক, নানা স্তরের শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী এবং আমাদের মতো অগ্রজ ও অনুজপ্রতিম সতীর্থদের সঙ্গে নিয়ে এক বছর ধরে দলনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সবুজদা। বক্তৃতা, আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, রসায়ন বিভাগে জ্ঞান সেন শতবার্ষিকী ভবন নির্মাণ, স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদি বহুবিধ

কর্মসূচীতে 'দশে মিলি করি কাজ'-এর সেই অভিজ্ঞতা ছিল আমার কাছে খুবই মূল্যবান।

বছর দশেক বাদে সবুজদার অধিনায়কত্বে 'টিম এনডিসি' আরও বড়ো কর্মকাণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছিল প্রথম ন্যাক মূল্যায়নের সময়। দিনক্ষণের হিসেবে ২০০৭-এর মার্চ। বেসক্যাম্পে জড়ো হওয়া পর্বতারোহীরা নানা ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটে কিছুতেই আর সামিটের উদ্দেশে রওনা দিতে পারছিলেন না। অবশেষে টিমলিডারের দায়িত্ব বর্তাল সবুজদার ওপর। ফিরে লেখা হল সেল্ফ স্টাডি রিপোর্ট, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হল রিনোভেশন ও ফেসলিফ্‌টিং, কলেজ ম্যাগাজিন ও নিউজলেটার প্রকাশনার কাজ এবং আরও নানাকিছু। সকাল থেকে রাত দিনের পর দিন নতুন ক্যাপটেনের নেতৃত্বে 'টিম এনডিসি' উজ্জীবিত হতে পেরেছিল অবনমনের খেলাটিকে চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় ঘুরিয়ে দিতে। ন্যাক পরিদর্শনের নির্ধারিত দিনগুলিতে বহিরাগত পরিদর্শকদের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগেছিলেন সবুজদা ম্যান মার্কিং-এর স্বভাবসুলভ মুনশিয়ানায়। যে কোনো সমস্যার কথা বললেই শুনিয়েছিলেন শুধু এক সহাস্য আশ্বাসবাণী, 'ম্যাঁয় হুঁ না'। বাস্তবে তাই হয়েছিল। সেটাই সবুজদার সঙ্গে কাজ করার সবচেয়ে বড়ো তৃপ্তি। এই নির্ভার, নির্ভয়, সদর্থক নেতৃত্ব অনেক কঠিন কাজ সহজ করে দিতে পারে। ২০০৭-এর তিনদিনের ন্যাক সামিট আমাদের অনেকের কাছেই এই কলেজের কর্মজীবনের খুব মূল্যবান অভিজ্ঞতা। কার্টেসি অধ্যাপক সবুজ সেন।

ছোটোবেলা থেকে পিতৃদেব অধ্যক্ষ জ্ঞান সেনের সূত্রে এবং পরবর্তীতে ১৯৬৮ থেকে চল্লিশ বছর শিক্ষকতা ও প্রশাসনিক কাজের সূত্রে নরসিংহ দত্ত কলেজের সঙ্গে সবুজদার ছিল দীর্ঘ গভীর আত্মীয়তা। অবসরযাপনের মানুষ ছিলেন না তিনি। এক সহাস্য উপেক্ষায় নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের ভালোমন্দ অগ্রাহ্য করে অবসরের আগে ও পরে কাজ করে গেছেন। কলেজ থেকে তাঁর অবসর ছিল কেবলই নিয়মের অনুশাসন। অবসরগ্রহণের পরেও মানসিকভাবে তিনি সর্বদাই যুক্ত থাকতে চেয়েছেন কলেজের সব ভালো-মন্দের সঙ্গে। নিয়মিত টেলিফোনে জানতে চাইতেন কলেজ কেমন চলছে, তাঁর পুরনো সহকর্মীরা কে কেমন আছেন, নতুন কারা যোগ দিল, ন্যাকের কাজকর্ম ঠিকঠাক চলছে কিনা ইত্যাদি নানা বিষয়। আর বিগত বারো-তেরো বছর ধরে কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চিরবিদায়ের দুঃসংবাদগুলি জানিয়ে গেছেন আত্মীয়বিয়োগের আন্তরিক বেদনায়। কলেজের ইতিহাস লেখায় উৎসাহ ছিল তাঁর। এই কাজের জন্য বিশেষ উপযুক্ত মানুষ ছিলেন তিনি। কলেজের পক্ষ থেকে এই কাজে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে কিছুদূর অগ্রসরও হয়েছিলেন। অতিমারির আবহে ব্যাহত হয়েছিল কাজ। এখন তো তাঁর নিজস্ব কিছু লেখালিখির পাশাপাশি অসমাপ্ত রয়ে গেল সেই নথিও।

তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই সবুজদা ছিলেন জীবন-মনন-অভীপ্সায় অসম্ভব সক্রিয় ও মেধাবী। ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে বিপ্লবী বাম

রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। অতঃপর হাওড়া জেলার পার্টি সংগঠন থেকে নানা তর্ক-বিতর্কে সওয়ার হয়ে ১৯৮০-র দশকে একটি সর্বভারতীয় বাম বিপ্লবী দলের পলিটব্যুরোর সদস্য। সত্তর দশকের শেষে অমল ঘোষ নাম নিয়ে লিখেছিলেন 'মূর্তি ভাঙ্গার রাজনীতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর' এবং তারপর ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে 'Assassination of a Tyrant'। আরও লিখেছিলেন 'হিন্দু জাতপ্রথা ও মণ্ডল কমিশন'। যুক্ত ছিলেন একাধিক বাংলা ও ইংরেজি বামপন্থী পত্রিকার সম্পাদনার কাজে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন 'নকশালবাড়ি আন্দোলনে ভিন্ন স্বর : দক্ষিণ ও বাম বিচ্যুতি বিরোধী ধারাগুলি' নামে প্রকাশিতব্য একটি দ্বিভাষিক সংকলন সম্পাদনায়। নৃতত্ত্বের কৃতি ছাত্র ও অধ্যাপক সবুজ সেন এভাবেই একান্ত অন্বিষ্ট ছিলেন জীবনবাস্তবতার সংগ্রামী অনুশীলনে। ১৯৯০-এর গোড়ায় সরে এসেছিলেন নিয়মিত রাজনৈতিক সক্রিয়তা থেকে। বেশি করে মন দিয়েছিলেন পঠনপাঠনে। আমরাও বেশি করে তাঁকে পেয়েছিলাম এই কলেজের বিদ্যায়তনিক পরিসরে।

এ-বছরের গোড়া থেকে অসুস্থ ছিলেন খবর পেতাম। হাসপাতালেও থাকতে হয়েছিল। তবু শরীর-স্বাস্থ্য-প্রতিকূলতাকে খানিক তুড়ি মেরে বেঁচে থাকার ভীষণ জেদ ছিল সবুজদার। তাই হঠাৎ চলে যাওয়াটা মানতে ইচ্ছে করছিল না। করছে না এখনও। শক্তির কবিতার লাইন দিয়ে শুরু করেছিলাম এই স্মরণলেখ। শেষ করছি শক্তি-সুহৃদ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই লাইনগুলি দিয়ে; 'তোমাকে যখন দেখি/তার চেয়ে বেশি দেখি/যখন দেখি না।' আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি না সবুজদা।

আমাদের সবুজদা

রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সবুজ সেনকে আমি স্কুল লাইফ থেকে চিনি। মানে আমার হায়ার স্কুলের সময় থেকে। অধ্যাপক সবুজ সেন। নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক। আমাদের সবুজ দা।

১৯৭৫ সাল হবে মনে হয়। তখন আমাদের বাড়িতে রোজ সকালে 'যুগান্তর' কাগজ আসত, এখন কাগজটাই বন্ধ হয়ে গেছে। একদিন সকালে কাগজের ফ্রন্ট পেজে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে প্রাক্তন নকশালদের একটা বৈঠকের ছবি দেখলাম। কয়েকজন তথাকথিত নকশাল বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আমাদের ব্যাঁটরা স্কুলের শিক্ষক সোমনাথ ঘোষ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন জয়প্রকাশের সঙ্গে ঐ বৈঠকে। আরো অনেকের সঙ্গে সবুজদাও ছিলেন। অধ্যাপক মানুষ। পাশাপাশি দুই বিদ্যায়তনের দুই শিক্ষক ঐ বৈঠকে।

সেই সময়, কৈশোরে অন্যান্য অনেক গুরুতর বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতি সম্পর্কেও ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করেছে রাজনীতি সচেতন পরিবারিক পরিমণ্ডলের সূত্রে। বাবা ছিলেন ঘোর কংগ্রেসী, কংগ্রেস নেতা বিজয় সিং নাহারের ঘনিষ্ঠ, অন্যদিকে কাকা বামপন্থী। এটা বোধহয় তখনকার দিনের মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারের যাপনচিত্রের এক পরিচিত অংশ ছিল। সেসময় আমার চেতনায় ধীরে ধীরে বামপন্থী ভাবনা সারকোলেট করছে। ইতিমধ্যে আমি আমাদের শিক্ষক হিমাংশুবাবুর নেতৃত্বে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাও' মার্কা মিছিলে হেঁটে ফেলেছি। এই অবস্থায় সোমনাথবাবুদের সঙ্গে সবুজ দা-কে দেখি। তখন সত্তরের দশকের মাঝামাঝি, 'নকশাল' শব্দটি আমার মতো তারুণ্যের অভিমুখে ছুটে-যাওয়া অনেক কিশোরের রক্তে শিহরন জাগাত অজস্র সত্য-মিথ্যা মেশানো কাহিনির কারণে। ফলে সোমনাথবাবু, সবুজদারা নিঃসন্দেহে আমাদের আগ্রহের মানুষ তখন।

পাঠক, সবুজ দা-কে নিয়ে এই লেখা। কিন্তু 'সবুজ-দা'র লেখ্য বিষয় হওয়ার কথা ছিল না। তাঁর উপস্থিতি লার্জার দ্যান লাইফ ছিল না, কারণ তিনি কোনোক্ষেত্রেই সেইসব সাফল্যের শীর্ষ দেশে পৌঁছাননি – যেসব 'সাফল্য'কে পালিশ করা ঝুটো সভ্যতা মান্যতা দেয়। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মনে হয়, তিনি নিজেকে শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার চাইতেও মনে প্রাণে চাইতেন সুস্থ সমাজের ইমারত গড়ার কাজে একজন একনিষ্ঠ শ্রমিক হিসাবে থাকতে – কাঠবিড়ালি অথবা দধীচির মতো। তিনি নিশ্চিত ভাবেই মহাবীর মারুতি বা দেবরাজ ইন্দ্র হতে চাননি। আসলে সবুজ দা-কে নিয়ে লেখার উদ্দেশ্য তাঁকে মহান হিসাবে, গ্লোরি ফাই করা কিম্বা তাঁর দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা নয় কখনোই। তিনি আজ সদ্য প্রয়াত। তাঁর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে যে বহমান ইতিহাস এগিয়েছে – বিশেষ করে সমকালীন রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে, শিক্ষাঙ্গনে – তা যদি আমার লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারি, সেইজন্যই এই প্রচেষ্টা। আমি ইতিহাসবেত্তা নই – মহামন্ত্রী বিদুরের মত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সবুজদার সঙ্গে চলমান ইতিহাসকে হয়তো তুলে ধরতে পারব না। মূল্যায়নের চেষ্টা ও করব না, কারণ আমি তার যোগ্য নই। কতগুলি টুকরো ঘটনা আমার মনে পড়ছে। তার ভিত্তিতেই তাঁর সঙ্গে সমকালীন বাস্তবতার টানাপোড়েন বোঝার চেষ্টা করব। যদিও বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর উপস্থাপনার তথাপি সমরৈখিক চলমানতায় সংযুক্ত।

সবুজদার স্মৃতিচারণা শুরু করি কলেজে ওঁর শেষ দিন থেকে – অর্থাৎ তাঁর ফেয়ারওয়েলের দিন থেকে। নৃতত্ত্বের বিভাগীয় প্রধান আমায় ডেকে বললেন আমি যেন অবশ্যই সবুজদার বিভাগীয় ফেয়ারওয়েলে থাকি। আমি কথা দিলাম থাকার। কারণ সবুজদা আমাদের শেষ কৈশোরের হিরো। সে সময় আমার মনেও রক্ত রঙ-এর স্পর্শ লেগেছিল এবং সবুজ দা ছিলেন সেই রঙের এমনই এক চিত্রকর। তবে ২০০৮ সালে ফেয়ারওয়েলের সময় সেই রঙ অনেকটাই বিবর্ণ – আমার মন থেকে না সবুজদার তুলি থেকে, সে বিষয়ে আর যাচ্ছি না। অবসরের আগের দিন স্টাফরুমে সবুজদাকে বললাম – দাদা আমি কিন্তু আপনার সম্পর্কে কেবল ভালো ভালো মনরাখা কথা বলতে পারব না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু টেঁড়ে হয়ে গেছি – তাই আপনার সমলোচনা দিয়েই শুরু করব। আমায় অবাক করে দিয়ে উনি জবাব দিলেন – তাই করবি। আমি সর্বদা সমালোচনা ইনভাইট করি এবং তা থেকে আমার উইকনেসগুলো বুঝতে পারি। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। পাঠক, অনুভব করলেন এই কথার গভীর ব্যঞ্জনা, বক্তার মননের গভীরতা ও বিস্তৃতি? এটাই সবুজদা, সবুজ সেন। আমার বাবা এই নীতিবাক্যই আমাদের ভাইবোনেদের শিখিয়েছিলেন। মনে আছে ১৯৮০ দশকে বাবা অশোক মিত্রর লেখা থেকে আমাদের শুনিয়েছিলেন – 'Always trust him who disagrees'.

১৯৮০-র দশকের শেষের দিক, আমি তখন পার্ট-টাইম লেকচারার হিসাবে নরসিংহ দত্ত কলেজে সবে ঢুকেছি। স্টাফরুম তিনটি সর্বদাই কোলাহল মুখর আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতক মহাসমুদ্র যেন। বিভিন্ন বয়সী রীডার, সিনিয়র লেকচারার, লেকচারার বিভিন্ন গ্রুপে বসে ক্লাসের ফাঁকে আলাপরত। রাজনীতির মেরুকরণও ছিল, মত পার্থক্য ছিল, কিন্তু মনান্তর ঘটেনি কখনো। আজ চাকরি জীবনের উপান্তে সেই দিনগুলোর কথা লোভীর মতো মনে করি। পার্টটাইমার

আমি ওঁদের দেখে শিখতাম, বুঝতাম রাজনীতি প্রশাসন ও শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে। আর সকল অগ্রজের মতো সবুজদা, পার্থদা, অমলবাবুর স্নেহধন্য ছিলাম। সবুজদা, পার্থদার কাছ থেকে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার আঁচ পেতাম। সবুজ দা একটা ইংরেজি প্রগতিশীল পত্রিকা সম্পাদনা করতেন – সম্ভবত Revolution। তাতে ধারাবাহিকভাবে নাগরিক অধিকার নিয়ে লেখার কথা আমায় বলেছিলেন। এভাবে তিনি সুস্থ প্রতিবাদী রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে চাইতেন।

এরপর সেই বিশেষ ঘটনা ২০০৫ সালে আমার হার্ট এঞ্জিওপ্লাস্টি। আমি যখন ট্রলি করে ক্যাথ্-ল্যাবে যাচ্ছি দেখি করিডোরে নরসিংহ দত্ত কলেজ উঠে এসেছে – শিক্ষক শিক্ষা কর্মীবন্ধুরা উৎকণ্ঠা চেপে রেখে হাসিমুখে হাত নাড়ছে। ঐ ভিড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত দীর্ঘদেহী সবুজদা মধ্যমা ও তর্জনী উঁচু করে তুলে হাসি মুখে ভি-সাইন দেখাচ্ছেন। উনি নিজেও হারেননি কখনো। বাইপাস সার্জারির পর যখন সিগারেট খেতে বারণ করতাম, তখন ক্ষুরধার যুক্তিতে প্রমাণ করতে চাইতেন সিগারেটে হার্টের ক্ষতি বিশেষ হয় না। যদিও তা ভ্রান্ত যুক্তি – যার খেসারত তাঁকে দিতে হয়েছে শেষের দিনগুলোতে।

পরিসর স্বল্প। এবার থামতে হবে। যদিও অসংখ্য ঘটনা ভিড় করে আসছে কলমের ডগায়। শেষে উল্লেখ করি NAAC কো-অর্ডিনেটর হিসাবে সবুজদাকে। কারণ তিনি ছিলেন আমার পূর্বসূরী। এই সহস্রাব্দের শুরুতে UGC-র ফতোয়া অনুসারে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে National Assessment and Accreditation Council (NAAC) কর্তৃক মূল্যায়ন করাতে হবে। কলেজে ইনার-পলিটিক্স এখানেও সক্রিয় – তুমুল মতপার্থক্য। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিদীর্ণ NAAC-এর পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করার জন্য শেষ পর্যন্ত সবুজ সেন হলেন NAAC Co-ordinator। আমি তো জোর গলায় বলব সবুজদা না থাকলে ২০০৭-এ NAAC-এর সফরে B++ এর স্তরে কলেজকে উত্তীর্ণ করতে পারত না। NAAC কমিটির কনিষ্ঠ সদস্য হিসাবে আমি ওঁকে ফলো করতাম – নেতৃত্বদানের এক সহজাত ক্ষমতা তাঁর ছিল। আর হ্যাঁ – কখনো হারতে জানতেন না। ঠিক-বেঠিক যাই হোক তিনি এগিয়ে যাবেন। তাঁর অনেক কাজের আমি সমালোচক ছিলাম – বিরোধিতাও করেছি T.C. মিটিং-এ। কিন্তু নেতৃত্বদানের ক্ষমতাকে কুর্নিশ করি আমি।

পরিশেষে বলি, দশচক্রে ভগবান ভূত হয় জানি। কিন্তু ভূত ও কখনো কখনো 'ভগবান' হয়ে যায় দশচক্রে পড়ে। যেমন আমার ক্ষেত্রে ঘটেছিল। সেই পটভূমি – যে পটভূমিতে সবুজ দা NAAC কো-অর্ডিনেটর নির্বাচিত হয়েছিলেন T.C. মিটিং-এ। টানাপোড়েনের পটভূমি। আমার ক্ষেত্রেও টানাপোড়েনের পটভূমি ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আমি নির্বাচিত হয়ে গেলাম NAAC কো-অর্ডিনেটর। আমার চাইতে অনেক যোগ্য মানুষ ছিলেন। যাই হোক সবুজদা ছিলেন যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি এই দায়িত্বে। আমি তাঁর কৌশল কিছুটা অনুসরণ করেছি মাত্র। সবুজদার রেখে যাওয়া কয়েকটা নুড়ি কুড়িয়েছি।

সবুজদা শান্তিতে থাকুন। নিশ্চয়ই দেখা হবে ওখানে। তখনও কিন্তু আপনার সমালোচনা করব। অবশ্যই গঠনমূলক সমালোচনা যা আজকাল খুব কম দেখা যায়।

সবুজ স্বপ্নের সওদাগর

বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সময়টা সত্তর দশকের শেষ আশির দশকের শুরু। আমাদের কলেজ জীবন। ইষৎ লায়েক হয়েছি। ডানা গজিয়েছে কিন্তু তেমন মজবুত নয়। সাহিত্যসংস্কৃতির চর্চা করতে গিয়ে বামপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। সঙ্গে প্রবল বই পড়ার নেশা। হুমড়ি খেয়ে পড়ছি জন রীডের 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন', এডগার স্নো-র 'রেড স্টার ওভার চায়না', হাওয়ার্ড ফাস্টের 'স্পার্টাকাস', নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির 'ইস্পাত', পার্ল বাকের 'গুড আর্থ', ম্যাক্সিম গোর্কির পাভেল ('মা') — এর পাশাপাশি মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' -র ব্রতী কখন যেন অজান্তেই আমাদের বিপ্লবের নায়ক হয়ে গেছে।

হঠাৎই হাতে এল 'মূর্তি ভাঙার রাজনীতি'। লেখক সবুজ সেন। পাতলা চটি বই। অঙ্গসৌষ্ঠবও তেমন যত্নে করা নয়। খানিকটা ইস্তাহার গোছের। সে বইও বন্ধুবান্ধব হাতবদল করে একনিঃশ্বাসে পড়া হয়ে গেল। ইস্কুলে পড়তে মাঝেমাঝে এখানে-ওখানে মনীষীদের মূর্তি ভাঙা-টাঙার খবর পেতাম। কারণটা ঠিক বুঝতে পারতাম না। তবে ছোটোবেলা থেকে যাঁদের প্রাতঃস্মরণীয় বলে জ্ঞান করে এসেছি তাঁদের অসম্মান ব্যথিত করত। এই বইতে দেখলাম অতিবাম রাজনীতিরই সক্রিয় কর্মী-সমর্থক জনৈক সবুজ সেন ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই হঠকারী কর্মকাণ্ডের নিন্দেই করেছেন। নকশালবাড়ি রাজনীতির আগুনমুখো বিপ্লবী চারু মজুমদারের বৈপ্লবিক পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করা সে সময়ে চাট্টিখানি কথা ছিল না। সবুজ সেন তাঁর বইতে অকাট্য যুক্তি দিয়ে সেই ধ্বংসাত্মক অতিবিপ্লবীয়ানাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম সে বই। মনীষীদের মূর্তি ভাঙাটা ভালো কাজ নয় জেনে বেশ আশ্বস্তও হয়েছিলাম।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকলো। পেশা বাছলাম সাংবাদিকতা। অধ্যাপনার প্রতি আলাদা কোনো আকর্ষণ নেই। তবু সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসলাম। চাকরি পেলাম বেশ দেরিতে। মাঝের সাতটি বছর (১৯৮৭-১৯৯৪) খুচরো সাংবাদিকতা, বিয়ে, সন্তান এসবে কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই কাটলো। সরকারের অনৈতিক কাজের মাশুল দিতে হল বহু তরুণ চাকরিপ্রার্থীকে।

অবশেষে হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেল ভাগ্য। আর সেখানেই দেখা পেলাম তরুণ বয়সে পড়া সেই 'মূর্তিভাঙার রাজনীতি' গ্রন্থের লেখক সবুজ সেনের।

নৃতত্ত্ব বিষয়টি আমাদের ছাত্রজীবনে এখনকার তুলনায় অনেক বেশি অপ্রচলিত ছিল। সায়েন্স বলতে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অঙ্ক জুলজি বোটানি এসবই বুঝতাম। তবে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে দেখলাম বড়ো ভাশুর-ননদ-নন্দাই অনেকেই এই বিরল বিষয়টির বেশ কৃতি ছাত্রছাত্রী। বড়ো জা (চুমকি পিপলাই) অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার গবেষক। নরসিংহ দত্তের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তনী। এবং আমি নরসিংহ দত্তে অধ্যাপনা পেয়েছি দেখে সব্বাই উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো 'ও তো সবুজ সেনের কলেজ'। যেন কর্মস্থলও আমার আর একটি শ্বশুরালয়ই হোল। আমিও কবুল করি 'হ্যাঁ, মানুষটির সঙ্গে আমার পয়লা দিনেই আলাপ হয়ে গেছে। তিনিও আমাকে তাঁর অনুজপ্রতিম বুড়ো-র (আমার স্বামী সৌমিত্র) বৌ বলে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছেন। মনে আছে আমাকে বলেছিলেন 'তোমার ভাশুর হলো আমার বন্ধু। আর বুড়ো? ওকে তো সেই কোন ছোট্টবেলা থেকে চিনি। আমাদের চ্যালা ছিল ও।'

মাঝারি হাইট, ডার্ক কমপ্লেকশন, তীক্ষ্ণ চোখের ব্যক্তিত্ব সবুজ সেন। খোলামেলা মানুষ। ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধে টৈটম্বুর কথাবার্তা। চলনে-বলনে নেতা গোছের একটা ভাব। দক্ষ অধ্যাপক শুধু নন সহকর্মীদের মধ্যেও খুবই জনপ্রিয়। আমরা হিউম্যানিটিজ পড়াই। কলেজের একতলার স্টাফরুমে আমাদের ঠাঁই। দোতলা-তেতলার বিজ্ঞানের শিক্ষকদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত কথাবার্তা হয় না বটে কিন্তু বিষয়ের সীমানা ভেঙে সমবয়সী সহকর্মীদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে তার টানেই ওপরের মানুষরা প্রায়ই নীচে নামেন। আড্ডা-তর্কবিতর্ক-ক্যারমখেলা- অ্যাকাডেমিক আলোচনা সবই চলে। অনেক সময়ই সবুজদা বক্তা। বিশেষ করে রাজনীতি-সমাজনীতির আলোচনায় সবুজদা মধ্যমণি। টিচার্স কাউন্সিলের উত্তপ্ত মিটিংএ এই কোনো সহকর্মী বন্ধুকে কষে একহাত নিচ্ছেন তো মিটিং শেষে তাঁরই সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বাড়ির রাস্তা ধরছেন। দিনে দিনে চিনলাম খুব দিলখোলা চনমনে আড্ডাবাজ বর্ণময় মানুষ সবুজ সেনকে। মুখ খুললে ছিটকে পড়ে মেধা, ধারালো যুক্তি। আরও বেশি করে তাঁর সংস্পর্শে এলাম নৃতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষামূলক ভ্রমণের সময়ে। তৎকালীন অধ্যক্ষ ড. কেশব মুখোপাধ্যায় গণিতের কৃতি ছাত্র অত্যন্ত মৃদুভাষী ভদ্র আপাদমস্তক রবীন্দ্রপ্রেমিক সজ্জন মানুষটি আমাকে অনুরোধ করলেন ডায়মন্ডহারবারে নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রসমীক্ষায় মেয়েদের সহযাত্রী হতে। কলেজে মহিলা শিক্ষক তখন হাতে গোণা। একজন যিনি বরিষ্ঠ অধ্যাপিকা আছেন তিনি ওই সময়টিতে বড়োদিনের উপাসনায় ব্যস্ত থাকেন। বাইরে গিয়ে মেয়েরা যদি কোনো মেয়েলি সমস্যায় পড়ে.....তাই আমার ওপরই এলো ছাত্রী সামলানোর গুরুদায়িত্ব। প্রথমটায় রাজি হচ্ছিলাম না......কন্যাটি তখন নেহাতই ছোটো। মাত্র তিন বছরের। তাঁকে ফেলে রেখে......

এ অবস্থায় প্রায় মাটি ফুঁড়ে মসিহার মতো হাজির হলেন সবুজ দা। 'ওকে রেখে যাবে কেন? ওকে সঙ্গে নিয়েই যাবে তুমি। আরে...ও তো আমাদের বুড়োর মেয়ে। ভাইঝি বলে কথা। আমাদের কোলে-পিঠেই তো ঘুরবে ও।' সত্যিই তাই হল। যথানির্দিষ্ট দিনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাগামী লোকাল ট্রেনে একটি অনতিবৃহৎ লাগেজ ও শিশুকন্যাকে নিয়ে রওনা হলুম। সঙ্গে নৃতত্ত্ব বিভাগের বিরাট সংসার। ক্যাপটেন অবিসংবাদী নেতা সবুজদা। সঙ্গে সিনিয়র মুকুলদা দীপকদাও আছেন। আর আছেন ল্যাবকর্মী বিমলদা। ফকিরচাঁদ কলেজে বসবাসের বন্দোবস্ত। বেলা বারোটা নাগাদ গন্তব্যে পৌঁছে ছাত্ররা পিকনিকের মেজাজে ঘুরঘুর করছে। সবুজদা কিন্তু পৌঁছনো মাত্র কোনো কথা না বলে কোনোক্রমে হাতটি ধুয়ে মাছের ঝোলের ঢাউস কড়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে টলটলায়মান ঝোল আর ভাসমান অজস্র আলু থেকে মাছের পিসগুলো সযত্নে আলাদা করতে লেগে গেলেন, পাছে মাছ ভেঙে যায়। আর তেমনটি হলে ভাঙা মাছের বঞ্চিত ভাগীদার হুলুস্থুলু কান্ড বাধাবে। আমাকে একবারটি জিগ্যেস করলেন 'আচ্ছা.... মাছের ঝোলে কি তেজপাতা দ্যায়?' এর সঠিক উত্তর আমার জানা ছিল না। কমনসেন্স খাটিয়ে বললুম, 'দিলে খুব অখাদ্য হবে বলে মনে হয় না.....বরং ঝোলের তেজ খানিক বাড়তেও পারে।' সবুজদা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। মনে হোল উত্তরটা মনপসন্দ হয়েছে।

ডায়মন্ডহারবারের কটা দিন ঝড়ের বেগে কাটলো। মেয়েদের দেখভাল আমাকে তেমন করতেও হল না। সবুজ-দার সবদিকে সজাগ দৃষ্টি। ফিল্ড করাচ্ছেন, ক্লাস নিচ্ছেন, ছাত্রছাত্রীদের খাওয়া-শোওয়া-আড্ডা-গল্প.... জনা তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ছাত্রছাত্রীর দিকে অলক্ষ্যেই কঠোর নজরদারি সবুজদা -র। সন্ধ্যেবেলাগুলোয় গানের আসর বসত। কলেজে আমি তখন নেহাতই নবাগত কিন্তু গান দিয়ে খুব অল্প সময়েই সহকর্মীদের পরিচিতি ভালোবাসা আদায় করে নিয়েছিলাম। আমার শিশুকন্যাটিও কচি গলায় গাইত। আধো বুলিতে আগডুম-বাগডুম বকে সবাইকে হাসাত। নৃতত্ত্ব আমার কাছে তখন হিব্রু ভাষার মতো। ফলে আমার সঙ্গী ছিল গল্পের বই। কন্যারত্নটি সারাদিনই থাকতো তার 'বিমলমামা'র কাছে। ফলে দায়িত্ব থাকলেও আমি মোটের ওপর ঝাড়া হাত-পা।

দেখতাম সবুজদা অনায়াসেই কেমন নেতৃত্ব তুলে নিতেন নিজের হাতে। বহু কর্তব্য পালন করতেন যা হয়তো আপাতভাবে তাঁর করার কথাই নয়। বিশেষ করে তা যদি কলেজের ব্যাপার হয় তাহলে তো কথাই নেই। হাওড়ার সাবেক কালীকুন্ডু লেনের বাসিন্দা বিখ্যাত বিজ্ঞানসাধক রসায়নবিদ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনের পুত্র সবুজ সেন নরসিংহ দত্ত কলেজটাকে কোনোদিন কর্মস্থল বলে মনেই করেননি। সবসময় বলতেন 'এই কলেজ আমাকে বড়ো হবার অন্নজল দিয়েছে। এখনও

আমাকে বেঁচে থাকার রসদ দেয় এই কলেজ। আমার আত্মপরিচয় দেয়। এই কলেজকে কোনোভাবেই আমি অসম্মান করতে পারি না।'

সবুজদা-র জ্ঞানী-গুণী পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনকে চাক্ষুষ করার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু কলেজের প্রথম দিনটিতেই অনেক গুণীজনের পাশে এই জ্ঞানসেন মশাইকে ছবিতে দেখেছি। পান্ডিত্যের পাশাপাশি তাঁর মনের কোমল ছায়াটুকু দেখেছি তাঁর মুখমন্ডলে।

সম্ভবত ৯৮ কি ৯৯ সাল এসে গেল জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনের শতবর্ষ। স্থির হল দিনতিনেকের উৎসবের মধ্যে দিয়ে পালিত হবে জ্ঞানেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী। রকমারি আয়োজন। সেমিনার, বক্তৃতা, ডিবেট, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রসংগীত-নজরুলগীতি-গণসংগীতের আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা.....এমনিই বর্ণময় অনুষ্ঠানে সেজে উঠলো কলেজ প্রাঙ্গণ। ছাত্রছাত্রীদের খুশি আর ধরে না। নেতৃত্বে আছেন বছর পঞ্চাশের টগবগে তরুণ প্রফেসর সবুজ সেন। অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর না করা পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। বেশ আনন্দময় উত্তেজনার মধ্যে দিয়েই কাটলো কটাদিন। ছাত্রছাত্রীদের সংগীত প্রতিযোগিতায় জজিয়তি করলাম। শেষে সবুজ দা-র বিশেষ অনুরোধে নির্বাচিত দুটি গান 'বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো' আর 'পুবহাওয়াতে দেয় দোলা'...... আইডিয়াল ডেমনস্ট্রেশন (সবুজ দা-র ভাষায়) হিসেবে গেয়ে শোনাতে হোল। সে সময় মানুষ নাগরিক ছিল। নেটাগরিক হয়নি। হাতে হাতে মোবাইল-নেট এসব ছিল না। সবাই এই ধরণের সাংস্কৃতিক আনন্দের নির্মল আস্বাদন নিত। বুক ভরে আনন্দ নিয়ে সে পর্ব চুকলো।

পরের প্রকল্প হোল ন্যাক এর কোঅর্ডিনেটর হওয়া। সেবার প্রথম ন্যাক ভিজিট। সম্ভবত এগারো সাল। প্রতিটি বিভাগে সাজো সাজো রব। অনলাইন প্রসেস না থাকায় ফাইল আর কাগজের পাহাড় জমছে। কলেজের সৌন্দর্য্যায়ন নিয়ে সবুজ দার ও মাথায় নানা ইনোভেটিভ ভাবনা। গোটা কলেজের ক্লাসরুমগুলোয় নম্বর লাগিয়ে দিলেন। শীতের সময়। মরশুমী ফুলে ভরে উঠলো বাগান। বহুদিনের জমা আবর্জনা সাফসুতরো করে আগাপাছতলা চুনকাম করে কলেজ নবকলেবরে সাজলো। কলেজ প্রেমিসে যখনই দেখা হয় সবুজদা নিজেই নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করেন.....'কি বলি বলো, আমার যে মেয়ের বিয়ে। পাত্রপক্ষ আসবে। মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে না রাখলে যদি অপছন্দ করে চলে যায়? শেষকালে কি অরক্ষণীয়া হবে আমাদের মেয়ে?'

সবুজ-দার স্বপ্নসন্ততি 'অরক্ষণীয়া' হওয়া দূরের কথা বহু কলেজকে পেছনে ফেলে ভালো গ্রেড পেল। দীর্ঘদিনের অবহেলায় শৈথিল্যে এলোমেলো অগোছালো হয়ে থাকা কলেজে নিয়ম এলো। এলো শৃঙ্খলা। বলতে গেলে তখন থেকেই সমস্ত অ্যাকটিভিটিজের রেকর্ড রাখা শুরু হোল। মাঝে মাঝে নিয়মের অনুশাসনকে আমাদের শৃঙ্খল বলে মনে হলেও 'ন্যাক' কলেজ শিক্ষকদের পরিণত হতে সাহায্য করলো। ভাঙা নৌকা নতুন ছাঁদে গড়ে তুলে তার কান্ডারি হলেন সবুজ দা। আমরা তাঁর অনুগামী আরোহী, চড়নদার। আর বিপুল এই কর্মযজ্ঞে সবুজ-দা কে নীরবে সহায়তা দান করে গেলেন তাঁর সহকর্মী বন্ধুদল। দীপকদা, পার্থদা, তরুণদা, তপনদা, সন্ধিদা, অনিমেষদা, সঞ্জীবদা, ফাল্গুণীদা, শ্যামলাদি, আশাদি, রীণাদি, কুন্তলদা, মানসদা সহ আরও অনেকে।

সবুজদা-র ডিএনএ তে 'সিনসিয়ারিটি' এবং 'কনফিডেন্স' শব্দদুটো গাঢ় দাগে খোদাই করা ছিল। যে দায়িত্বই নিতেন ধৈর্য ধরে নিখুঁত ভাবে পালন করতেন। নরসিংহ দত্ত কলেজকে ভালোবেসেছিলেন কখনও মা-এর মতো কখনো মাতৃভক্ত সন্তানের মতো। অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারতেন। যৌবনের বিপ্লবীসত্তা প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও ক্লান্ত হয়নি। সেই সঙ্গে ছিলেন সুসংগঠক। বিয়ে করেছিলেন পত্রালিকা বৌদিকে। ইনি বিখ্যাত বামপন্থী তাত্ত্বিক পন্ডিত বনবিহারী চক্রবর্তীর কন্যা। দুই অত্যন্ত বুদ্ধিমতী কন্যার পিতাও হয়েছিলেন। কালীকুন্ডু লেনের পৈতৃক আবাসে দীর্ঘকাল থাকার পর একটি ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন হাওড়া বাইপাসের ধারে। কালীকুন্ডু লেনে থাকতে একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হন সবুজ দা। সুস্থ হয়ে আবার কলেজে ফেরেন। অবসরের পর উচ্চ রক্তচাপের কারণে আবার অসুস্থ হন। কিন্তু মস্তিষ্কের সক্রিয়তা কখনোই কমেনি। কমেনি রসবোধ। ভাটা পড়েনি আড্ডার জমাটি মেজাজে। আমার সঙ্গে সম্পর্কটা অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী, শ্বশুরবাড়ির দীর্ঘদিনের পারিবারিক বন্ধু ছাড়াও এক ব্যক্তিগত রসায়নের নিবিড়তায় পৌঁছেছিল।

যে কোনো মানুষের মধ্যেই ইতি নেতি দুটি দিকই থাকে। সবুজ দা ও কিছু সীমাবদ্ধতা নিয়েও ভালোমানুষই ছিলেন। হয়তো একটা সময় সমাজবদলের স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই একধরণের সততাই ছিল বেঁচে থাকার অবলম্বন। সবুজ দার মতো মানুষরা এই কর্পোরেট পুঁজিসর্বস্ব কেজো পৃথিবীটার থেকে ক্রমশ কমছে। বসন্তের বজ্রনির্ঘোষে সবুজদাদের যৌবনের স্বপ্ন সফল হয়নি। কিন্তু স্বপ্নের মৃত্যু হয় না। তার রূপের বদল ঘটে মাত্র। আশা রাখি নতুন প্রজন্মের বুকে আগামী দিনের স্বপ্ন নিয়ে চির সবুজদা রা বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল।

সবুজদা

সিদ্ধার্থ সেন

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এই শতকের গোড়ায় যখন এসেছি নরসিংহ দত্ত কলেজে তার আগে কলেজ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা বলতে সরকারি কলেজে দীর্ঘকাল অংশকালীন শিক্ষকতা আর তারপর উত্তরবঙ্গের একটি কলেজে কিছুকাল পড়ানোর পুঁজি। নরসিংহ দত্ত কলেজের মতো একটি বিখ্যাত কলেজের নাম প্রথম শুনেছিলাম আমার এক দাদার কাছে। তিনি এই কলেজে বহুকাল আগে বিজ্ঞান বিভাগে পড়তেন,তাঁর মুখে শুনেছিলাম অধ্যাপক পার্থ সেন, তপন আচার্য, সবুজ সেন প্রমুখের নাম। শেষের নামটির সঙ্গে গত শতকের সত্তরের দশকের অগ্নিময় বিপ্লবের যোগের কথাও একটুআধটু শুনেছিলাম তাঁর কাছে । আর বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র দত্ত, বারীন্দ্র বসু প্রমুখের পাশাপাশি ইংরেজি বিভাগের কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগের দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের নামগুলি অজানা ছিল না। কিন্তু একদিন আমি যে এসে পড়ব অসংখ্য গুণী এই সহকর্মীদের মাঝে তা জানা ছিল না। একসময়ের রীতি হিসেবে কলেজে প্রথম যোগ দিয়েছিলাম সান্ধ্য বিভাগে। কিন্তু বিকেল ৪টের আগেই বেশির ভাগ দিন কলেজে পৌঁছে যেতাম আর স্টাফ রুমে সারি সারি নবীন - প্রবীণের প্রাণোচ্ছল প্রবাহের মধ্যে গিয়ে পড়তাম, নবাগতের পরিচয় অচিরেই ঘুচে গেল দাদা-দিদিদের স্নেহ-ভালোবাসায় যদিও সিনিয়রদের সঙ্গে একধরনের সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব ছিল। তখন কলেজে ছিল ‘দিবারাত্রির কাব্য’ দিনের দাদাদের বেশির ভাগই বাড়ির পথে পা বাড়াতেন সন্ধে পার করে। নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক, আলোচনা, ঠাট্টা-মস্করা, টি ক্লাবের ফ্লাস্কে জল নিয়ত ফুটছে আর বারবার চলছে কলরোলের ‘ওঠানামা চায়ের তুফানে’— স্টাফ রুম ভেসে যাচ্ছে। এককোণে ক্যারাম বোর্ডে খেলা চলেছে – সব মিলিয়ে চারপাশ গমগম করত। দু-একদিনের মধ্যে আলাপ হল মাঝারি চেহারা, শ্যামবর্ণ, থুতনিতে বেশ-মানানো ফ্রেঞ্চকাট, উজ্জল দুটি চোখের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, বললেন ‘আমার নাম সবুজ সেন’। তার আগে শুনেছি উনি নৃবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ও পরবর্তীকালে খ্যাতনামা অধ্যাপক, একসময়ে অতি-বাম আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগের কথা। শুনেছি উনি কয়েকবছর দিবা বিভাগের উপাধ্যক্ষের দায়িত্বভারও পালন করেছেন। আমি যখন যোগ দিই তখন প্রাতঃ বিভাগে উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মিতা মুখার্জী, দিবা বিভাগে অধ্যাপক শ্রীনিবাস দেবনাথ আর সান্ধ্য বিভাগে অধ্যাপক মদনমোহন রায়। সবুজদার পিতা অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন রসায়ন শাস্ত্রের কৃতবিদ্য অধ্যাপক ও একসময়ে নরসিংহ দত্ত কলেজে বেশ কিছুকাল মাননীয় অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কলেজ সম্পর্কে তাঁর একধরনের অপত্যস্নেহ ছিল আর তা যেন উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তেছিল সবুজদার উপরে। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর একান্ত নিজস্ব আবেগ ও নাড়ির টান ছিল। প্রতিষ্ঠানের নানা কাজেকর্মে তাঁর সংযোগ, উৎসাহের সঙ্গে নানা দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন তিনি, অনেক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছেন সামনে থেকে। এমনই কাজের উদাহরণ হিসেবে আমাদের মনে পড়ে যাবে কলেজে প্রথম ন্যাক পি-আর টিমের পরিদর্শনের কথা। হঠাৎ করেই কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব গ্রহণ করে নানাজনকে নানা কাজের দায়িত্ব দিয়ে ও তাঁদের সঙ্গে নিয়ত সমন্বয় করে, সকলের মাঝে ‘প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার’ তিনি চমৎকারভাবে নির্বিঘ্নে কলেজের সকলের সহযোগিতায়, পরিদর্শক দলের কবলমুক্ত করে এই সংকটকে পার করে দিলেন, কলেজের কপালে জুটল বি++ গ্রেড; তার আগে কলেজের নথিপত্র সবকিছু গোছানোর অভ্যাস ছিল না। তারও একটি অভ্যাস তৈরি হল। স্টাফ রুমে নিছক আড্ডায় সবুজদার নিয়ত অংশীদারিত্ব আর নানা আলোচনামূলক বিতর্কে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণে বুঝতে পারা যেত শুধু নিজস্ব চর্চিত বিষয় নয়, নানা বিদ্যার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। শিক্ষক পরিষদের কোনো কোনো সভায় উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়, তর্কাতর্কি হত। সেই বক্তাদের মধ্যে সবুজদাও থাকতেন। কিন্তু সভা শেষের পর আবার স্টাফ রুমে তাঁদের মধ্যেই হাসাহাসি, চা-পান, ধূমপান, আড্ডা আর একসাথে বাড়ির পথ ধরা এই ছবিও দেখা যেত। সবুজদাও সেই দলের সদস্য ছিলেন।

নানা শারীরিক অসুস্থতা তাঁর ছিল, প্যাংক্রিয়াসের সমস্যা, হৃদযন্ত্রের সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপকে তুড়ি মেরে সবুজদা ধূমপান করতেন। দুয়েকবার বারণ করতে গিয়ে স্নেহমিশ্রিত ধমক খেয়েছি। আসলে বিপদের সীমারেখাকে সবার মন মানতে চায় না, অভ্যস্তও হতে চায় না। সবুজদা সেই গোত্রের মানুষ ছিলেন। নানা অসুস্থতার মাঝেও তাঁর মস্তিষ্কটি সচল ছিল, প্রায়ই পুরোনো কিছু সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের খবরাখবর নিতেন। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের মিলনমেলায় যোগ দিতেন। কলেজের ইতিহাস রচনার মতো একটি গুরুভার দায়িত্ব সবুজদা গ্রহণ করেছিলেন, সেই কাজ ধীরে এগোচ্ছিল কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের তাঁর হঠাৎ চলে যাওয়ায় সে কাজে ছেদ পড়ল। সম্ভব হলে সেই আরব্ধ কাজ কোনোদিন যদি পূর্ণতাকে স্পর্শ করে সেদিন সবুজদার অবদানকে আমরা আশা করি মনে রাখব।

অমল ঘোষ – এই ছদ্মনামের আড়ালে সবুজদা উত্তাল সত্তর দশকের শেষার্ধে (সম্ভবত) লেখেন একটি পুস্তিকা ‘মূর্তি ভাঙ্গার রাজনীতি– রামমোহন ও বিদ্যাসাগর’। সেই শীর্ণ আকারের পুস্তিকাটিতে তিনি তাঁর দৃষ্টিকোণে এই সমস্যাটির প্রতি আলোচনা করেছেন ও এই আন্দোলন যে সঠিক ছিল না তা ব্যক্ত করেছেন। ‘অমল ঘোষ’

যে সবুজ সেন তা অনেক পরে জেনেছি। ১৯৮৪ সালে ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির হত্যার পর 'Assassination of a tyrant' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন। মণ্ডল কমিশন বিষয়টিও তিনি নিজের রাজনৈতিক ভাবাদর্শের নিরিখে ছাপার অক্ষরে ধরে রেখেছেন। কলেজের চৌহদ্দির বাইরে কয়েকবার সবুজদা ও বৌদির সঙ্গে দেখা হয়েছে থিয়েটারের হলে। সবুজদা নাটক দেখতে ভালোবাসতেন আর মাঝে মাঝে খবর নিতেন ভালো থিয়েটার সম্পর্কে। অনেকদিন ধরেই সবুজদার শরীর তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছিল না। স্ট্রোক হওয়ার পর কথাও খানিক অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল কিন্তু তাঁর কথা বলা থামে নি। বেশ কিছুদিন আগে কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে সকলকে চিন্তায় রেখে সবুজদা শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরেছিলেন। ফিরে আসার পর একদিন আমরা কয়েকজন দেখা করতে গিয়েছিলাম তাঁর ফ্ল্যাটে। সবুজদা আনন্দে কারও নিষেধ না মেনে স্বাভাবিকভাবেই গল্প করলেন, হাসি - ঠাট্টাও হল, অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করলে অনেকক্ষণ বাদে খুব হালকাভাবে বললেন মাঝে মাঝে সামান্য শ্বাসকষ্ট হয়, তেমন কিছু নয়। আসলে ভয়কে তিনি বহুকাল আগেই জয় করেছিলেন। গত বছরের মার্চ মাস থেকে যে মারণ-মহামারি কত অচেনা-চেনা প্রিয় মানুষদের চিরকালের জন্য চোখের সামনে থেকে টেনে নিয়ে গেল মৃত্যু নামের যবনিকার আড়ালে তার শেষ কোথায় কে জানে! মৃত্যু জীবনের স্বতঃসিদ্ধ সত্য সেই কথা মেনে নিয়েও কোনো কোনো মৃত্যুকে মেনে নিতে মন চায় না। মানুষ হিসেবে কোনো মানুষই সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না, সারা জীবনটাই সেই মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনা। সবুজদাও সেই নিয়মের বাইরে নন, আমরা কেউই নই। সবক্ষেত্রে ব্যতিক্রম তো থাকেই, তার সংখ্যা নামমাত্র। কিন্তু মনে হয় সময় যেভাবে ক্রমশ পালটে চলেছে তাতে একদিন সবুজের বজ্রনির্ঘোষের কালের একজন সেনানী সবুজদাদের মতো মানুষদের থাকার এখনও প্রয়োজন ছিল কেননা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি ঘুমিয়ে থাকলেও সেই আপাত ঘুমের আড়ালে থাকে সুপ্ত আগুনও। একদিন যে যুবশক্তি 'আধমরাদের ঘা মেরে' বাঁচার স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করেছিল সেই চাওয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সবুজদার মতো মানুষেরা সেই স্বপ্নকে লালন করতেন, তাঁর বিশ্বাসের দর্শন থেকে তিনি ভিন্নমার্গের পথিক হন নি। তার জন্য প্রয়োজন সাহস, ভয়কে জয় করার সাহস।

এও এক আশ্চর্য সমাপতন সবুজদা চলে গেলেন আপামর বাঙালির প্রিয় একটি দিনে– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে। ওইদিন বাংলা বিভাগের আন্তর্জালিক মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালনের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরেই কুন্তলবাবুর ফোনে জানতে পারলাম সবুজদার চলে যাওয়ার কথা। কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইলাম। এই মহামারি যেন মহাভারতের সেই পৌরাণিক চরিত্র বকরাক্ষস যার জঠরপূরণের জন্য প্রয়োজন হতো একটি প্রাণের কিন্তু এই অদৃশ্য রাক্ষসের জঠরজ্বালা নেভানোর জন্য অসংখ্য প্রাণের বিনষ্টি বয়সের নিয়ম না মেনে ঘটে চলেছে রোজ– এর শেষ কোথায় জানা নেই। এই অসহায়তা ক্লান্ত করে, ক্ষুব্ধ করে প্রতিরোধের ব্যর্থতায়। সবুজদাও শঙ্খ ঘোষের কবিতার সেই মানুষটির মতো যেন মৃত্যুর স্থির ভবিষ্যতের দিকে এগোতে এগোতে অস্পষ্ট অথচ অমোঘ সেই উচ্চারণ করেছেন: 'শরীর দিয়েছ শুধু বর্মখানি গেছ ভুলে দিতে।' আমরা কেউ শুনি নি সেই কথা যা বৈশাখের জীর্ণ বৃন্তচ্যুত ধূলিধুসর পাতার ডানায় ভর করে উড়ে গেছে গঙ্গার বুকে জমে-থাকা অন্ধকারের দিকে পঁচিশে বৈশাখের ওই দিনটিতে।

প্রকৃতি

প্রীতি মান্না
দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ (সাম্মানিক)

প্রকৃতি যে অরণ্য সৃষ্টি করে তাকে আমরা বলি প্রাকৃতিক অরণ্য। প্রাকৃতিক অরণ্য বিভিন্ন ফলে, ফুলে ভরা এবং নানা ধরণের জানা ও অজানা গাছে পরিপূর্ণ থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের উৎপত্তি পৃথিবী সৃষ্টির সময় কাল থেকে। বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ। আর আমরা মানুষেরা সেই প্রকৃতিকে বিভিন্ন ভাবে দূষিত করছি। যেমন, আমরা মাটিকে দূষণ করছি রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে। বিভিন্ন শিল্প, পারমাণবিক বিস্ফোরণ প্রভৃতি থেকে নির্গত বর্জ্য মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া হয়, যার ফলে মাটির তেজস্ক্রিয় দূষণ ঘটে।

প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার — প্লাস্টিক একটি অবিয়োজিত পদার্থ অর্থাৎ এগুলি সহজে নষ্ট হয় না। কিন্তু মানুষের দ্বারা এই প্লাস্টিকের ব্যবহার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এগুলি বিয়োজিত হয় না বলে দীর্ঘদিন ধরে মাটিতে সঞ্চিত থাকে এবং বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যে মাটিকে দূষিত করে। তাছাড়া বৃক্ষছেদন, অতিরিক্ত পশুচারণ, খনিজ উত্তোলন মাটির গুণগত মান হ্রাস করে। বৃক্ষ মানুষ তথা প্রাণীমাত্রেরই খাদ্যের একমাত্র উৎস। বৃক্ষ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। জীবনের অন্যতম উপাদান অক্সিজেন তৈরি করে এবং সরবরাহ করে। মানবজীবনে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বৃক্ষ নিধনপর্বের অনিবার্য পরিণতির হাত থেকে রেহাই পেতে প্রতিবছর বৃক্ষরোপণ অভিযান চলে আসছে।

আমাদের উচিত একটি বৃক্ষ নিধনের পূর্বেই তার বদলে কমপক্ষে চারটি করে চারা রোপণ করা এবং সময়ে সেগুলো লালনপালন করা। আমরা বাড়ির চারপাশে কিংবা টবে নিজে হাতে কোনো বীজ বপন করি আর সেই বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হয়ে যে চারাগাছের জন্ম নেয় এবং তা থেকে কোনো ফসল হলে আমাদের নিজেদেরই ভালো লাগবে।

গাছ লাগালেই হয় না, তার যত্ন করা প্রয়োজন তাছাড়া পুরোনো অরণ্যরাজিও যত্ন ও সংরক্ষণাদি প্রয়োজন। বৃক্ষরাজি মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী। কাজেই বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আমাদের চারপাশের পরিবেশকে সাজাতে হবে সবুজ শ্যামলিমায়। আর গাছের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে সরবরাহ করা মাটির সহজাত অভ্যাস। তাই মাটিকে অযথা দূষণ করা ঠিক নয়। তাই ভূমিক্ষয় রোধ করে মাটির জীবের বাড়াতে হবে। মাটি নাড়াচাড়া করে মাটির জৈবিক বাড়ানো যায়। নির্দিষ্ট মাটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট সময়ও দিয়ে জৈবিক উর্বরতা বৃদ্ধি করতে হবে। এইভাবে আমরা প্রকৃতি সংরক্ষণ করতে পারি।

‘যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনি আর্তের উপকারার্থে না লিখিল সে লেখনি নিষ্ফলা হউক’

— *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*

ভ্রমণপিয়াসী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঋতুবৃত্তা দত্ত
দ্বিতীয় সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ (সাম্মানিক)

ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি ।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির কাছে বিশেষ একটি নাম। বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং তাঁর বিশাল সাহিত্যকীর্তির জন্য তিনি বহু বাঙালির রক্তস্রোতে আজও মিশে আছেন।

তিনি ছিলেন বাংলার দিকপাল কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটোগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'গুরুদেব', 'কবিগুরু' ও 'বিশ্বকবি' অভিধায় ভূষিত করা হয়। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য সুইডিশ অ্যাকাডেমি তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে নিজের দেশে বসেই সাহিত্যসৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। তিনি যে ভ্রমণ করতেও ভালোবাসতেন সেই বিষয়েই দু-চার কথা বলতে গিয়ে লেখনি ধরেছি। ''আমি ভ্রমণ করতে ভালোবাসি, কিন্তু ভ্রমণের কল্পনা করতে আমার আরও ভালো লাগে'' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীর্ঘ ভ্রমণসূচির দিকে তাকালে প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর এই উক্তিটি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরেছেন তিনি। শান্তিনিকেতনে চল্লিশ বছর কাটিয়েছেন ঠিকই কিন্তু কখনো দেহলিতে, কখনো দ্বারিকে উত্তরায়ণ ছাড়াও কোনার্ক, পুনশ্চ, শ্যামলী, উদীচীতে। পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ এসেছে, অস্ট্রেলিয়া ছাড়া সব মহাদেশেই তিনি পদার্পণ করেছেন। ভারতের এমন কোনো বড়ো শহর নেই যেখানে তিনি যাননি ।

আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের লেখার সঙ্গে ভ্রমণস্মৃতি কীভাবে মিশে আছে, কীভাবে এবং কী ভেবে এসব ছোটো-বড়ো ভ্রমণকে তিনি গ্রহণ করতেন। কবি লিখেছিলেন, 'আমার দিনের সকল নিমেষ ভরা অশেষের ধনে', কষ্ট হয় যখন দেখি সেই অমূল্য দিনগুলি অপহৃত হচ্ছে ।

ভ্রমণরসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমগ্রজীবন ধরে যে সমস্ত জায়গায় ভ্রমণ করেছেন তার কিয়দংশ তুলে ধরার চেষ্টা করলাম ।

১) জীবনস্মৃতি পড়ে জানা যায়, জোড়াসাঁকোর বাড়ির বাইরে তার প্রথম ভ্রমণ পেনেটি বা পানিহাটিতে। ১৯১৯ সালের মে মাসের শেষে আরও একবার 'পেনেটি বাগান' দেখার সুযোগ হয় কবির। ভ্রমণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের টান ছিল পুরুষানুক্রমিক। কবির কাছে ভ্রমণ ছিল সাধনা। তিনি বলেছিলেন, 'পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়, পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়' । রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে প্রথমে এলেন বোলপুরে। এরপর সাহেবগঞ্জ, দাশপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁরা বিশ্রাম নিতে নিতে পৌঁছলেন ডালহৌসি। কবি প্রথমবার শিলাইদহে যান ১৮৭৫ সালে, পিতার সঙ্গে ।

২) রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সতেরো, তিনি প্রথমবার বিলেতযাত্রা করেন মেজোদাদার সাথে। বিলেতযাত্রার আগে তাঁরা আমেদাবাদে কিছু সময় নির্বাহ করেন বিলেতিয়ানা রপ্ত করার জন্য। সেখানে দাদার সাথে শাহীবাগের বাদশাহী প্রাসাদে ছিলেন। কবি বলেন, 'আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে...তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা।' উপযুক্ত আধার পেয়ে শাহীবাগ নিজের রহস্য যেন উজার করে দেয় কবির কাছে। শাহীবাগের নির্জনতাই গল্পকারকে অনুপ্রাণিত করেন 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্প লিখতে। আমেদাবাদ থেকে বম্বে (মুম্বাই) পরে জাহাজে চড়ে বিলেতযাত্রা করেন। বিদেশযাত্রার দেড় বছর পরে প্রায় অসময়েই ফিরে আসেন লেখক। এরপরে মাদ্রাজ যাত্রার পরে ফিরে এসে, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সময় না কাটিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সাথে বেড়াতে গেলেন চন্দননগরে। এরপরে কখনো তেলেনিপাড়ার বাঁড়ুজ্যেদের বাগানে, কখনো মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে। দ্বিতীয় বাড়িটি লেখকের খুব পছন্দ হয় । সেখানে বসে তিনি 'এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর/তোর তরে কবিতা আমার' কবিতা লিখেছিলেন। আবার তাঁদের সঙ্গে এসে উঠলেন চৌরঙ্গীর ১০ নং সদর স্ট্রিটের বাড়িতে। এইখানে বসে তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা রচনা করেন ।

৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সপরিবারে দার্জিলিং যাত্রা করেন। বেশ কয়েকবছর পরে আবারও যখন দার্জিলিং যাত্রা করেন তখন সেখান থেকে কার্শিয়াং বেড়াতে যান এবং শেষ বয়সে মংপু ও কালিম্পঙ-এ ঘুরেছেন। দাদার আদেশে জমিদারি দেখাশোনার জন্য শিলাইদহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং সেখান থেকে শাহজাদপুর ও পতিসরে ঘুরেছেন। শিলাইদহ, শাহজাদপুর ও পতিসরে থাকাকালীন তিনি ৬১ টি ছোটোগল্প রচনা করেন ।

৪) ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে ভরতপুর যান। ভরতপুর যাত্রার পরে ফেরার পথে আগ্রায় আওয়াগাড়ের

মহারাজার অতিথি হয়ে আসেন। আগ্রায় ছুটি কাটানোর পর শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। এর কিছু সময় পরে তিনি মালয়, সিঙ্গাপুর, মালাক্কা ঘুরলেন। পরে তিনি কুয়ালালামপুর, পেরাক, ইপো, পেনাং -এ বেড়ান ।

৫) ১৯২৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ব্যক্তিগত কারণবশত। ১৯৩০ -এর শুরুতেই কবি বরদা গেলেন, আগ্রা, লখনৌ, আমেদাবাদ প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে ফিরলেন। এর কিছুদিন পরে প্যারিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেখান থেকে তিনি ম্যুনিখের ওবারয়্যামারগাও গ্রামে যান। কবির রাশিয়া যাওয়ার আকাঙ্খাও পূরণ হয়।

নোবেলজয়ী কবি জীবনকালের শেষ সময়েও ভ্রমণে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারেননি। মোট বারোবার তিনি বিশ্বভ্রমণে বেরোন। পাঁচটি মহাদেশের তিরিশটিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেন। সেইসময় ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়ায় তিনি বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯৪১ সালে জোড়াসাঁকোর বাসভবনেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে ।

‘চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি, জরা, মহামারিতে উজাড় হয়ে যাবে, আর দেশের মানুষ ‘ভগবান, ভগবান’ করবে — এমন ভগবত প্রেম আমার নেই। আমার ভগবান আছে মাটির পৃথিবীতে। স্বর্গ চাইনা, মোক্ষ চাই না, বরে বারে ফিরে আসি এই মর্ত্য বাংলায়।’

— *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর*

পৃথিবী-যুদ্ধ-মানুষ

রৌণক বসু
স্নাতকোত্তর, দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ

পৃথিবীটা যুদ্ধে যুদ্ধে শেষ হবে কোনো একদিন।
সিন্দুকে পড়বে চাবি
হঠাৎ ঝুলবে তালা, গেটে সৈনিকের লাশ।
নাম কাটা যাবে একে একে - দম্ভ, রিক্ততা, অহং।
চূড়ান্ত উচ্চতায় সেদিন শোষিতের বুভুক্ষু আস্ফালন।

কে তুমি? কী চাও? বোশেখের এই নির্জন সন্ধ্যায়?
রক্তপাত? শুধুই সবজে নীল রক্ত ছড়িয়ে যায়।
ছিটিয়ে চলে হিংসা,
রক্তের অভিঘাত।
ভলগা থেকে গঙ্গা
গঙ্গা থেকে গ্রামান্তর।
ক্লান্ত শবের পচা ভালোবাসায় জেগে ওঠে দুর্গন্ধ।
পিত্তহীন বিস্বাদ।
রোগগ্রস্ত কিছু মাছি কেবল ওঁত পেতে থাকে
কিছু জন্তু পালায়।
শব্দ আশাতীত হতে হতে, একদিন হয়ে ওঠে শব্দাতীত নৈঃশব্দ্য।
আশাহীন নিরক্ত অবসাদ।

জেগে থাকে একজোড়া চোখ,
দু-টুকরো নারীমাংস,
স্রোতের আদরে সংখ্যাতীত দেহ,
দেহহীন অবয়ব।
প্রতিরোধ আর, প্রতিবাদে মেঘলা দুপুর ঘনিয়ে আসে।
কলকাতা শহরে শখের বৃষ্টি উড়ে যায়।
চোখ মেখে নেয় এক মাটি মায়াকাজল।
আমরা হেঁটে চলি
আমাদের হেঁটে চলতে হয়।

দূর থেকে দুরান্তর।।

বন্ধুর ঠিকানায়

বুদ্ধদেব বর
ষষ্ঠ সেমেস্টার, নৃবিজ্ঞান বিভাগ (সাম্মানিক)

দেখবো চল আজ নীল আকাশ
রঙ মেশানো শান্ত ঘাস
দিন গুনেছে ফুলের দল
এই বেলাতে খেলবি চল।
যাচ্ছে চলে মন খারাপ
ভেজা ঘাসে পায়ের ছাপ
লুকোচুরির দিন বদল
ওই দিগন্তে ছুটবি চল।
চল না যাবো তোকে নিয়ে সেই নদীরই কিনারায়
যেখানেতে ইচ্ছেরা রাত চেনাবার পাহারায়,
চুপটি করে থাকবো বসে আমরা ওই সীমানায়
চোখে চোখে বলবো কথা বন্ধু তোরই ঠিকানায়।

তোমায় খুঁজি

তিয়াসা সেনাপতি
স্নাতকোত্তর, চতুর্থ সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ

তোমায় খুঁজি শীতের শেষে গরমকালের গন্ধে,
তোমায় খুঁজি শেক্সপীয়ারের রোজালিন্ড, অরল্যান্ডে।
তোমায় খুঁজি মনখারাপে তোমার গাওয়া গানে,
তোমায় খুঁজি দশমীতে সমুদ্রে যাওয়ার প্ল্যানে।
তোমায় খুঁজি স্মরণজিতের কবিতা আর গল্পে,
তোমায় খুঁজি অভিমানের অবাধ্য সংকল্পে।
খুঁজতে গিয়েই খেয়াল করি, হারিয়ে গেছে খেই—
অচেনা হাওয়া মনে করায়, আছো আমার মধ্যেই।

নির্বাণের পথে অনির্বাণ

অনির্বাণ দলুই
ষষ্ঠ সেমেস্টার, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

আমির মোহে

হ্যাঁ রে মন, সুধাই তোরে
এ আমি কোন সে আমি!
আমি ঠিক এরূপ তো নই,
এ আমি কোন বেনামি!

এ আমির অহম্ বড়ো,
আমি আমি গন্ধ ছাড়ে!
দার্শনিকের গহন মনে,
এমনটা কী হতেও পারে!

কত শত শ্মশান ঘুরে,
কত আমি পুড়ল এসে!
তবুও যে এই আমিতে,
এত আমি রইল শেষে!

হ্যাঁ রে মন উপায় কী বল,
এ আমি মারব কিসে?
তার পথ খুঁজেও যে আজ,
কোথাও যে পাইনে দিশে!

হ্যাঁ রে মন, সুধাই তোরে
এ আমি কোন সে আমি!
এ অহম্ আমার তো নয়,
এ আমি কোন বেনামি!

তার খোঁজে

আমি তার খোঁজে হই দিশেহারা!
তার হদিশেই জগৎ ছাড়া!
কল্পনারও রসাতলে,
ধরতে গেলেও দেয় না ধরা!

চোখের জলে গঙ্গা ভাসে,
তবুও সে মুচকি হাসে!
নীল তারাটি খেয়েছে গিলে,
খুঁজি তারে কোন আকাশে!

পথের কবি পথের খোঁজে,
সব হারিয়ে পথে বসে!
তবুও কি তার হয়না দয়া,
পালিয়ে বেড়ায় কোন সে রোষে!

রাজার কাছে তলব করি,
জীবন কি মোর বৃথাই তবে?
অর্থ খোঁজার পাগলামিতে,
সমস্তটা মিথ্যে হবে!

তবে কিসের জন্ম!
কিসের মরণ!
কিসের এত প্রশ্ন করা!
অর্থহীনের সাধনাতেই,
সত্য জানার তলব করা!

আমি তার খোঁজে হই দিশেহারা!
তার হদিশেই জগৎ ছাড়া!
কল্পনারও রসাতলে,
ধরতে গেলেও দেয় না ধরা!

অনির্বাণ

মৃত্যুরে কই শোন্ অতিথি,
কিসের তরে আসিস রে তুই ?
শূন্যবাদের শূন্যতাতে
খুঁজে মরি বিদেশ বিভুঁই।

লোকে বলে আজব কথা,
জন্মালে মরিতে হবে !
তবে আমি পাইনা ভেবে,
জন্মটা হলই কবে ?

জনমের আগেও তো নেই,
মরণের পরেই বা কই ?
তার মাঝে ছিলাম কিনা,
বোঝবার উপায়টা কই ?

নড়নের উপায় যে নেই,
পড়েছি এ কোন ফাঁদে !
আমির তবে স্বরূপটা কী,
দুদিনের সময় বাদে !

যে শিশু জন্মেছিল,
সে শিশু মরল কোথায় !
যে বুড়ো মরল আজই,
সে বুড়োর জন্ম কোথায় !

যেই আমিটা তাদের মাঝে
সে তো শুধুই হওয়ার মায়া !
হাতে খুঁজি, আঁতে খুঁজি
কোথায় বলো তাহার ছায়া !

আজও আমি হাতছানি দেয়,
দার্শনিকের গহন মনে।
আজও সেই পথের কবি,
পথ হারানোর ভাগ্য বোনে।

তুইতো শুধু তারেই নিবি,
যার যাওয়াটা নিয়তিতে !
বাকিরা সব মরল কোথায়,
অর্থ খোঁজার পাগলামিতে !

মৃত্যুরে কই শোন্ অতিথি,
কিসের তরে আসিস রে ভাই !
চল আমি তোর সঙ্গে যাবো,
প্রতিক্ষণে যেমনটা যাই !

হেডফোন

সায়ন কুন্ডু
দ্বিতীয় সেমেস্টার, বানিজ্য বিভাগ (জেনারেল)

রাত বারোটা কানে হেডফোন,
চোখ ঢুলছে ঘুমে।
চলছে কানে সানডে সাসপেন্স,
একলা আমি রুমে।।

হেডফোন ছিল ভীষণ প্রিয়,
সঙ্গী ছিল ফোন।
মৃদু আওয়াজ স্যাড সং আর,
ভারাক্রান্ত মন।।

দুইটি কানে গল্প জমায়
সে হাসায় এবং কাঁদে।
নিয়ম করে প্রেম জমায় সে,
রোজ বিকেলের ছাদে।।

হেডফোন আজ ছিন্ন হয়েছে,
রয়েছে ছেঁড়া তার।
একটি কানে শব্দহীনতা,
তাই আজ সে বেকার।।

নাম ছিল তার হেডফোন,
কান দুটি ছিল প্রিয়।
এমনি করেই হৃদয় মাঝে,
আমায় রেখে দিও।।

বিষের ছায়া

শুভঙ্কর দত্ত
দ্বিতীয় সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ (সাম্মানিক)

বাতাসে আজ বিষের ছায়া
রোগাক্রান্ত মানবকায়া
আকাশ ছেয়েছে মানবরোগে
আতঙ্কে তাই মানুষ ভোগে।
শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে
মানুষ চাইছে রাজনীতিকে
মৃত্যুভয় দিকে দিকে
জ্বলছে আগুন পৃথিবীর বুকে।
জাতের বিভেদ হচ্ছে বঙ্গে
মানুষ নেই আর মানুষের সঙ্গে
বুঝবে কবে মানবজাতি
এই লড়াইয়ে তাদের ক্ষতি।
শান্তি আসুক পৃথিবীতে
সকল মানুষ থাকুক সুখে
মহামারি যাবে মুছে
লড়াই করব একসাথে।
পরিস্থিতি হোক না কঠিন
মানবতায় বদলাবে দিন।।

অচেনা পৃথিবী

তিয়াসা গোলুই
দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (সাম্মানিক)

হঠাৎই সামনে এল 'করোনা'
এক অচেনা বিপদের করাল ছায়া,
থাবা বসাল সর্বত্র,
ভেঙে পড়ল শিক্ষা, অর্থনীতি
সবকিছুই প্রায়।

জনাকীর্ণ স্কুল-কলেজ, অফিস
আদালত সবই হল জনশূন্য।
মানুষকে আজ দিতে হচ্ছে যেন,
সম্মুখ লড়াইয়ে তার জীবনমূল্য।

চারিদিকে আজ শুধুই হাহাকার,
মারণ ভাইরাসের শিকার হচ্ছে
কত প্রাণ পরপর।

নতুন কত শব্দ যোগ হল রোজকার অভিধানে,
কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন, আরও কত কী
যেন এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন, এক ভয়ার্ত অভিশাপ
কোথায় শেষ এর?

কবে আবার সব স্বাভাবিক হবে?
সমস্ত বিপর্যয় কাটিয়ে আবার কবে
চেনা হবে অচেনা এই পৃথিবী?

মাতলির রথ ও অজাতশত্রু

রক্তিম ভট্টাচার্য

স্নাতকোত্তর, দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ

(০)

দেশোদ্ধারে নেমেছে সবাই। ক, খ, গ, ঘ। তারা আগেও ছিল। এবার নতুন সংযোজন ঙ। প্রথম চারটি দল। 'ক' দলের নেতার নাম ক, 'খ' দলের নেতা খ, 'গ' দলের গ, 'ঘ'-এরও তাই। শেষ-জন একা। একজন ব্যক্তি। একাই সে দল। আগামী সর্বদলীয় সমাবেশের জন্য সব দল নিজেদের প্রস্তুত করে নিচ্ছে।

দেশ অবশ্য এমন কিছু ঝামেলায় পড়েনি যে দমকল বা বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ডেকে তাকে উদ্ধার করতে হবে। সে ভালোই আছে। দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। কিছু টুকিটাকি ঝামেলা সব আমলেই চলে। মূল গাছ একটাই, শাখা-প্রশাখা একেকরকম-ভাবে বাড়ে। একেক মালি একেকভাবে ছাঁটে। কেউ কম, কেউ বেশী। টোটালিট্যারিয়ান, তবে 'শান্তিপূর্ণ'। এই পুরো সিস্টেমটাই কিন্তু রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক। মানে, রাষ্ট্র-ই সব। রাষ্ট্রের জেলখানায় বন্দী দেশ। একটু ঘেঁটে যাওয়া ব্যাপার বটে, তবে একবার মগজে ঢুকে গেলে বোঝাটা তেমন জটিল কিছু না।

(১)

এই রাষ্ট্র-বন্দী দেশকে উদ্ধার করতেই ক-এর পথে নামা। পথ বলতে একটা কংক্রিটের রাস্তা, যার শেষ মাথায় একটা পেল্লায় সাদা বাড়ি। ওখানেই সাদা মাথার রাষ্ট্র-নায়ক বসেন। তাঁকে ঘিরে বসেন সাদা মাথার শাগরেদরা। কালো মাথার কেউ ঢুকতে গেলে মাথা ঢাকা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। ক-এর মাথা কালো। কিন্তু মাথা ঢাকা দিয়ে ঢোকায় তার ঘোর আপত্তি। কেমন অস্বস্তিকর লাগে। কিন্তু উপায়ও নেই। তার শখ রাষ্ট্র-নায়কের সঙ্গে দেখা করার।

শুধু শখ নয়, একটু খুনের ইচ্ছেও আছে। আগে কখনও খুন-টুন করেনি ক। ছোটখাট গুন্ডামি করেছে, জেল খেটেছে। মনে মনে খুব ইচ্ছে জাগে, একদিন সেই সাদা বাড়ির মালিকটাকে রাস্তায় নামাবে। দু'-হাতে মুঠো করে ধরবে তার সাদা চুল। ছিন্নভিন্ন করবে তাকে। শাগরেদগুলোকে হত্যা করে ছড়িয়ে দেবে রাস্তায়। শকুন নামবে রাজপথে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে মাংসপিণ্ড। সেই দেখে আনন্দে হাততালি দেবে শিশুরা। তারা আজ বড়ই থমথমে। প্রকাশ্যে কাঁদতে পারে না কেউ। জড়িয়ে ধরতে পারে না কেউ কাউকে। সেই কবে একটা ভয়াল অতিমারি গ্রাস করার সময়ে অর্ডার জারি হয়েছিল, কেউ কারোর কাছে ঘেঁষতে পারবে না, সেই অর্ডার এখনও জারি আছে। এক জায়গায় দু'জনকে দেখলেই মার, তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার। সে পারে না এ-সব মেনে নিতে। দৌড়তে ইচ্ছে করে, চ্যাঁচাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু দিনের শেষে আগাগোড়া মধ্যবিত্ত জীবনের নিয়ম মেনে বাড়ি। লাউশাক-চচ্চড়ি, ভাত। বিছানায় আধ-ঘন্টা তোলপাড়। বাকিটা আবার পরের দিনের জন্য তোলা থাকে।

(২)

খ দেশের মাথা। আবার ভুল হল, দেশের মাথা বলে কিছু হয় না। বলা যেতে পারে, রাষ্ট্রের মাথা। যাকে ক খুন করতে চায়। খ-ও জানে। কিন্তু সে-কাজ যে ক কোনোদিনই পারবে না, তাও খ জানে। খ এ-ও জানে, তাকে সরাতেও কেউ পারবে না। মানুষ কী-চায়, সে সব থেকে ভালো বোঝে। মানুষ যেটা বোঝে না, সেটাও কী-করে বুঝিয়ে দিতে হয় জানে। তার সব থেকে বড় শক্তি, সে সব জানে। এই জানার পরিধিটা কতটা সেটা অবশ্য জানতে পারেনি। শুধু এটা জানে, তার থেকে বেশী যে জানতে চাইবে, তাকে অজানার দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে যেনতেন প্রকারেণ। এই ভেবেই সে শান্তিতে আছে, আপাতত কেউ দাবি করেনি, যে তার থেকে বেশী কেউ জানে। ক কিছু জানে না খ জানে। গ যেটুকু জানে, তার থেকে বেশী কিছু জানার ইচ্ছে নেই এও খ জানে। চিন্তা আছে ঙ-কে নিয়ে। এ ব্যাটা একেবারে নতুন এ-লাইনে। আনপ্রেডিক্টেবল পার্টিগুলোকে নিয়ে চিন্তা হয়। কখন কী করে বসবে আগে থেকে আন্দাজ করা যায় না। তবে এখানে একটাই কথা, ঙ একা। কোনো দল নয়। একক-চিন্তাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তার আছে এটুকু বিশ্বাস খ-য়ের আছে। তবুও, আগামী সমাবেশে লোকটাকে একবার বুঝে নিতে হবে। তারপর বাকিটা তো পকেটের কেরামতি।

(৩)

গ ক-এর সব থেকে বড় শত্রু ছিল। ছিল, অর্থাৎ অতীতে। এখন সেই স্থান-দখল করেছে খ। গ-কে কেউ পাত্তা দেয় না এখন সেভাবে। এক সময়ে প্রচণ্ড প্রভাবশালী ছিল। এখন বাড়িতেই শয্যাশায়ী। অতিমারির সময় থেকেই গ বাড়িতে। বাইরে বেরোতে পারে না বলে মনে কষ্ট খুব। কিন্তু কিছু করারও নেই। গ জানে, তার পক্ষে এখন আর ওঠা সম্ভব নয়। অনেকের হাত ধরতে চেয়েছে, অনেকে তাকে বাইরে নিয়ে যাবে বলে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত কেউ কথা রাখেনি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আবার কেটে পড়েছে। গ-এর আগে রাগ হত, ঘৃণা হত। কী-সব দিন কাটিয়েছে তারা! আন্দোলন, লড়াই, যুদ্ধ। প্রকাশ্য রাস্তায় শাসকের দিকে তর্জনী তুলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ হয়নি। শাসকেরও ক্ষমতা ছিল না প্রতিবাদ দমন করে। হাতাহাতি

হয়েছে, খুন-জখম হয়েছে। কিন্তু তারা স্তিমিত হয়ে যায়নি। কিন্তু এখন কেমন সবটাই পালটে গেছে। নতুন যারা দল চালাচ্ছে, কিছুতেই পুরনো ভাবধারা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছে না। হবে হবে করেও কিছু হচ্ছে না। দপ করে একবার জ্বলে উঠছে, পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, সবটাই কি স্বপ্ন? কিন্তু স্বপ্ন কি বারবার আসে? একই স্বপ্ন? একই সময়? বারবার? গ আবার ঝিমিয়ে পড়ে।

কিন্তু গ জানে, তাকে কেউ ভুলবে না কোনোদিন। তার দেখানো পথ, তার আদর্শ এখনও স্কুলে, কলেজে পাঠ্য। তরুণ প্রজন্ম তার মতাদর্শকে ভরসা করছে। গ খবর পায় চার-দিক থেকে। নতুন নতুন ছেলেমেয়েদের এগিয়ে আসতে দেখলে চোখে জল এসে যায় তার। গ জানে, এরা যদি পোক্ত-হাতে হাল ধরতে পারে, তা-হলেই বদল আসবে। আক্রমণের বিরুদ্ধে বুক পেতে দেবে। বাড়িয়ে দেবে গোলাপ। আবার প্রতি-আক্রমণের রাস্তাও তৈরি করে রাখবে। সময়ে-অসময়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিশান ছোটাবে, ওড়াবে বিপ্লবের আগুন-ফুলকি। ঘুম আসছে গ-এর আবার। এই এক রোগ। ভালো কথা ভাবলেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। সকালে উঠে মনে থাকে না আগের রাতের কথা। তবু, গ লিখে রাখে। কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তারা আবার বদল ঘটাতে পারবে সমস্ত পরিকল্পনা করে রাখে। লুকিয়ে লুকিয়ে। সবার আড়ালে। বিপ্লবের নতুন পথ চট করে দেখিয়ে দিতে নেই। সে-পথ যদি ওরা নিজেরা খুঁজে পায়, তবেই শিক্ষা সার্থক। গ ঘুমিয়ে পড়ে।

(৪)

ঘ-কে নিয়ে কেউ কিছুই বলে না। ঘ নিজেও নিজের বিষয়ে বেশী উৎসাহী নয়। ক, খ, গ সবাইকেই তার একইরকম লাগে। সবাই ভালো, সবাই খারাপ। ঘ জানে, তার কোথায় গুণ, কোথায় দোষ। খুঁজে না পেলেও দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা করে। নানা পরিকল্পনা করে। কিন্তু কোনোটাই সঠিকভাবে ফলপ্রসূ হয় না। একবার সে ভেবেছিল ক-কে সঙ্গী করে একসঙ্গে কাজে নামলে কেমন হয়! নেমেছিল, চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লাভ হয়নি। নিজের কুঁড়েমি-ই হোক, বা, ক-এর একপেশেমি, ঘ পরাভূত হয়। তাতে অবশ্য রাগ, দুঃখ কিছুই হয়নি। নেমে পড়েছিল গ-এর হাত ধরতে। তাতেও ফল সেই এক। নিজে থেকে এতদিন লড়ে এসেছে, কিন্তু এখন কেমন একা একা লাগে। কেমন ভয় করে। তবে কি সায়াহ্নে এসে পৌঁছল? বুঝতে পারে না। ভাবে। আলোচনা করে। কূল-কিনারা পায় না। তারপর সব গুটিয়ে রেখে ঘুমোতে যায় নিশ্চিন্তে। পরেরটা পরেরদিন ভাবা যাবে। সোজা হিসেব।

(৫)

ঙ একা। প্রকৃত-অর্থেই একা। সে কাউকে চায়ও না। ও জানে, ওকে ক, খ, গ, ঘ সবাই প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। ও জানে, ফ্রি-থিঙ্ক আর গ্রুপ-থিঙ্কের পার্থক্য। ও জানে, কালেক্টিভ আনকনশাস। ও এও জানে, কোথায় কোথায় ও বাকি সবার চেয়ে আলাদা। কিন্তু এটা জানে না, কোথায় গিয়ে ও কারোর কেউ নয়। কেন আলাদা, কেন এই পৃথকীকরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, এটা সে জানে না। তবে একবার আগামী সর্বদলীয় সমাবেশে কিছু একটা তুরুপের তাস ফেলতে পারলে ভালো কিছুর সম্ভাবনা আছে। ঙ প্রস্তুত হয়। ঙ নিজেকে ভাঙতে চায়। ঙ নিজেকে নিয়ে খেলতে চায়। ঙ হাসে, কাঁদে, রাগে, অভিমান করে। নিজের সঙ্গে নিজের এই অদ্ভুত সঙ্গোপনে নিজেই অভিভূত হয়। শুধু ভয় জাগে, পারবে তো? তাক থেকে নীৎশে-র বই পেড়ে পড়তে বসে ইজিচেয়ারে।

(৬)

আজ সমাবেশে জনতার উপস্থিতি লক্ষণীয়। এত ভিড় শেষ কবে হয়েছে? কে-ই বা দেখেছে? উত্তেজিত জনতার স্রোত যেন পারলে মঞ্চে উঠে পড়ে।

বক্তব্য শেষ করেছেন ক। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন শাসক-দলের প্রতি তার ক্ষোভ। পরিষ্কার বলেছেন, আগামী নির্বাচনে তাঁর দল বিপুল ক্ষমতায় ফিরবে। খ দলের কোনো অস্তিত্বই রাখবে না তারা। জনতা খেপে খেপে হাততালি দিয়েছে।

খ যা জানেন সবই বলেছেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। প্রতিটা সভাতেই মোটামুটি যা বলেন, এখানেও তাই। অতিরিক্ত কথা নয়, স্রেফ জানিয়েছেন যোগ্যতম-রাই তাঁর শাসনাধীনে থাকবেন। বাকি সব বহিরাগত। জনতা মুহুর্মুহু হাততালি দিয়েছে।

গ কথা বলেছেন, তবে অল্প। শারীরিক অসুস্থতার জন্য আগেভাগেই বক্তব্য শেষ করেছেন। জানিয়েছেন, শাসক বা প্রধান বিরোধী কারোর পক্ষেই সম্ভব না দেশটাকে সংশোধন করার। তাঁরাই পারবেন একমাত্র। যদিও জনতা খুব বেশী হাততালি দেয়নি বলার শেষে।

ঘ উঠেছেন আর বসেছেন। গ-এর কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন মোটামুটি। তবে তাঁর বক্তব্যে নার্ভাসনেস ছিল স্পষ্ট। কথা বলতে বলতে গলা কাঁপছিল বারবার। কয়েকমিনিট পরেই বসে পড়েন আবার। বলাই বাহুল্য, জনতার মধ্যে কিছুই সে-রকম প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

সর্বশেষ বক্তা হিসেবে বলতে উঠেছেন ঙ। সবাই লক্ষ করেছেন, ঙ আসার সাথে-সাথেই জনস্রোত যেন আছড়ে পড়েছে। এই নতুন বক্তা কী বলেন তা শুনতে আগ্রহী সবাই।

মঞ্চ কাঁপাচ্ছেন ঙ। তাঁর বক্তব্যের একের পর এক পয়েন্ট চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে ক, খ, গ, ঘ সবারই পিঠে। গমগম করছে পুরো সমাবেশ। চিৎকার করছেন। কখন যে আবেগ এসে বাস্তবিক সত্তাকে ভুলিয়ে ঙ-কে অন্য জগতে নিয়ে গেছে, তিনি বুঝতেও পারেননি। কাউকে ছাড়ছেন না। কার্যত চুনকালি লেপছেন প্রতিটা দলের মুখে। তাঁর মুখ দিয়ে ফুলকির মতো উড়ে আসছে শিক্ষা, দুর্নীতি, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান, কুসংস্কার, মনস্তত্ত্ব, দর্শন,

ধর্ম, সমাজ, ভালোবাসা, প্রতিহিংসা। একদম মাঠের ভাষায়, মফস্বলের ভাষায়। জলের মতো বক্তব্য গড়িয়ে পড়ে জমে যাচ্ছে মগজের আস্তাকুঁড়ে। সে-জলে আগুন নেভে না, আগুন জ্বলে দাউ দাউ করে।

বলার শেষে ঙ-এর মনে হল, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটা মানুষই ঙ। মঞ্চেও আলো করে আছেন সবাই ঙ। আর নিজের শরীরে কোথাও গিয়ে ভাগ হয়ে গেছে ক, খ, গ, ঘ। খানিকটা ঙ-ও।

(৭)

পরদিন সকাল। দেশের প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বড় বড় করে শিরোনাম অজানা আততায়ীর হাতে নিহত ঙ

আর ভেতরে হত্যার অনুমিত বর্ণনা, শরীরে মারের দাগ, কাটারির ক্ষত, গুলির চিহ্ন, লাঠির আঘাতের দাগ স্পষ্ট। দেশের বিদেশের প্রতিটা সংবাদপত্র জুড়ে শুধু এই খবর।

'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' প্রতিটা দল প্রেস বিবৃতি দিয়ে ঘটনার দুঃখপ্রকাশ করেছে।

'ক' দলের প্রেস বিবৃতি 'খ' দলের কাজ। ঙ আমাদের বন্ধুর মতো ছিলেন। পরিবারকে পাঁচ-লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হবে। কাল প্রতিবাদ মিছিল বেরোবে দেশ-জুড়ে।

'খ' দলের প্রেস বিবৃতি আততায়ী 'ক' দলের। 'গ' বা 'ঘ' দলের হওয়াও বিচিত্র নয়। ঙ আমাদের খুবই কাছের লোক ছিলেন। পরিবারের প্রতি সমবেদনা। পরিবার চাইলে একজন সদস্যকে চাকরি দেওয়া হবে। আর আগামী সন্ধ্যায় একটি মোমবাতি মিছিল আয়োজিত করা হবে।

'গ' দলের প্রেস বিবৃতি কমরেড ঙ অমর রহে। দেশ-জুড়ে বারো-ঘণ্টার ধর্মঘট চলবে কাল। এই হত্যার জবাব শাসক-দলকে দিতেই হবে। পরিবারের প্রতি গভীর শোক-প্রকাশ করছি।

'ঘ' দলের প্রেস বিবৃতি কী ঘটেছে পুরোপুরি না-জেনে কিছু মন্তব্য করা ঠিক নয়। ঙ আমাদের ভাইয়ের মতো ছিলেন। আত্মার প্রতি শান্তি-কামনা করি।

(৮)

কঃ এই ধর্মঘট মানা হবে না। মানুষকে ঝামেলায় ফেলার ধান্দা...

খঃ উত্তাল সময়ে জনতা শান্ত থাকুন। অপরাধীকে ধরার সব-রকম প্রচেষ্টা জারি আছে।

গঃ খ অযোগ্য। উনি পদত্যাগ করুন। ধর্মঘট সফল করতে দেশ-জুড়ে সক্রিয় হোন সবাই।

ঘঃ আমরা মানুষের পাশে আছি। খ অপরাধীকে ধরতে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

(৯)

কঃ আততায়ী 'খ' দলের লোক। এ-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

খঃ তদন্ত চলছে। কিছুদিনের মধ্যেই জানা যাবে, কে ঠিক, কে ভুল।

গঃ সরকার কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। প্রধান বিরোধী হিসেবে 'ক' ও চরম ব্যর্থ।

ঘঃ তদন্তে কী হবে জানি না, তবে ক'দিন পর সরকার এ-সব থেকে হাত তুলে নেবে।

(১০)

জাত-ধর্ম-বর্ণ-দল-হীন এক দেশে হাসছেন ঙ। তিনি জানেন, আততায়ী 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' কোনো দলেরই লোক নয়। সে-শুধু তাঁর বিরোধী।

হাসতে হাসতেই দেখতে পাচ্ছেন ঙ, সেদিনের সভায় সমস্ত ঙ হয়ে ওঠা জনতার গা থেকে শামুকের খোলসের মতো কী-একটা চড়চড় করে ভেঙে পড়ছে। ভেতর থেকে ক, খ, গ, ঘ বেরিয়ে আসছে আবার।

ঙ হাসলেন। একটু কাঁদলেন। রাগ, অভিমান সব-ই হল, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাওয়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে গেলেন।

শিক্ষা

মৌসুমী মিত্র
স্নাতকোত্তর, দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ

অফিস থেকে আজ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। ফেরার পথে কেক কিনে ফিরতে হবে। আজ আমার ছেলের জন্মদিন।

সোজা গেলাম পার্ক স্ট্রিটের বিখ্যাত ফ্লুরিজ এ। আমার ছেলের চকোলেট কেক পছন্দ। সেটাই কিনলাম। কিনে পার্কিং এরিয়া র দিকে যাবো এমন সময়ে দেখি একটি ছোট ছেলে, গায়ে ধুলো, পরনে ছেঁড়া জামা আর প্যান্ট, আমার পা ধরে বলছে

— অনেকদিন কিছু খাইনি বাবু। আমায় দুটো টাকা দেবেন? আজ কিছু খেতাম।

আমি হ্যাট হ্যাট করে ওকে তাড়িয়ে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরলাম। বাড়িতে ততক্ষণে অতিথি আসতে শুরু করেছে। গোটা বাড়িটা ইভেন্ট প্ল্যানার খুব সুন্দর সাজিয়েছে। চারিদিকে বেলুন আর বেলুন। আমার ছেলে রনিকে খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে কোর্ট প্যান্ট পরে। পাশে তার মা।

আমায় দেখেই ছুটে এলো রনি। আমি নিচু হয়ে খুব স্নেহের সাথে বললাম – হ্যাপি বার্থডে রনি। তোমার কি গিফট্ চাই বলো সোনা, বাবাই তোমায় সেটাই এনে দেবে।

রনির হাসিমুখে যেনো আলোর ঝিলিক খেলে গেলো।

— বাবাই সত্যি আমি যা চাইবো তুমি তাই দেবে? প্রমিজ করো?

— হ্যাঁ সোনা, প্রমিস। বলো।

— বাবা আজ যে এত আয়োজন, এত ভালো ভালো রান্না, এত গিফট্, রিটার্ন গিফট্, চলো না বাবাই আমরা তাদের দিই যারা কিছু ভালো খেতে পায়না, ভালো গিফট্ পায়না।

ছেলের কথা শুনে আমার মনে মনে খুব গর্ববোধ হলো। কিছুক্ষণ আগে যে ঘটনাটা ঘটালাম সেটা মাথায় এলো। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেলো। ভাবলাম আজ আমার ব্যবহার দেখলে আমার স্বর্গীয় বাবা মা ঠিক যতটা অসন্তুষ্ট হবেন ঠিক ততটাই খুশি হবেন তাঁদের নাতিকে দেখে।

মনে মনে স্মরণ করে বললাম

– তোমরা ওকে মন ভরে আশীর্বাদ করো যাতে ও প্রকৃত মানুষ হতে পারে। শিক্ষিত তো আমিও কিন্তু মানুষ হিসেবে ও আজ এগিয়ে গেলো আমার থেকে। আমি তাতে ক্ষুব্ধ নই বরং গর্বিত।

বললাম, চলো আগে কেক টা কাটি। ওদের কে কেক ও তো দেবো নাকি?

‘তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না; যা বিশ্ব সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে’

— *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

নতুন নববর্ষ

অনিন্দিতা জাশু
চতুর্থ সেমেস্টার, বায়ো-সায়েন্স (জেনারেল)

চৈত্র মাস শেষের পথে। আর হাতে গুনে সাত দিন পরই নতুন বছরের শুরু! বৈশাখী, পয়লা বৈশাখ আরও কত রকম নামে পালন করা হয়ে থাকে বাংলা বছরের সূচনার দিনটিকে। পয়লা বৈশাখ খুবই শুভ একটা দিন আপামর বাঙালির কাছে। কিন্তু সাত দিন পর যে পয়লা বৈশাখ সে খেয়াল কি মানুষের আছে ? ভোটের প্রচার, করোনা বাড়ছে, লকডাউন হতে পারে! এরকমই হাজারটা বিষয়ের মাঝেই চাপা পড়ে আছে আপাতত এই একুশ সালের বৈশাখী!

বাজার সংলগ্ন জায়গা। তিনদিক দিয়ে তিনটে ঢালাই করা রাস্তা এসে মিশেছে বাজারের মাঠের কাছে। সন্ধ্যাকালীন বাজার নিয়ে বসেছে কয়েকজন। ফুচকা, আইসক্রিমের স্টলও এসেছে। রাস্তার ধারের দোকানগুলোয় লোকজন কেনাকাটা করতে ব্যস্ত। আর পাঁচটা দিনের মতই জমে উঠেছে সন্ধ্যার বাজার।

লং স্কার্টটা ঠিক করতে করতে হেঁটে যেতে যেতে চারিদিকে তাকিয়ে একটু অবাক হলো উমা। কেউ মাস্ক পড়েনি, কোনো দূরত্ববিধি পালনের ব্যাপার নেই।

''রাজ্যের বাইরে, রাজ্যে এত করোনা বাড়ছে এদের দেখো নিয়ম পালনের কোনো বালাই নেই! আর পালন করবেই বা কেন ভোট উৎসব শুরু হয়েছে না! বাবা ঠিকই বলে সাধারণ মানুষগুলো আসলে খুবই বোকা নিজেদের চালাক দেখতে গিয়ে নিজের ভালোটাই বোঝে না।'' নিজের মনে কথা গুলো ভেবে নিয়ে হাতে থাকা লাল সাদা রঙের শিশি আর তুলি গুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বাজারের পাশের ক্লাবটার দিকে এগিয়ে গেল। ক্লাবের গেটের কাছে এসে নাম লেখা বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে দুদিকে মাথা নেড়ে ক্লাবের ভিতর চলে গেল উমা।

''হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি'' ক্লাবটার বাইরে একটা বোর্ডে বড় বড় করে লেখা। দোতলা ক্লাবটা এলাকার বেশ পরিচিত ও চর্চিত তাদের সমাজ সেবার জন্য। নিজের তলায় দুটো রুম। একটা বড়ো আর একটা ছোট। উপরের তলাটা পুরোটা জুড়েই একটা হল ঘর মত সেখানে রোজ টিউশন পড়ায় এলাকার কিছু শিক্ষক।

ক্লাবে ঢুকে সোজা উপরে চলে গেল উমা। জয়ন্তী আর মায়া দোতলাটা মুছে বেরিয়ে এলো।

– ''তুই এসে গেছিস উমা। চল উপরে আল্পনা গুলো দিয়ে নিই, তারপর নিচের গুলো দেখা যাবে''। জয়ন্তিকা হাতের বালতিটা সিড়ির ধাপে বসিয়ে দিয়ে বল।

– হ্যাঁ সেটাই বরং ভালো। এমনিতেই আজ পুরোটা শেষ করা হবে বলে মনে হয় না। (মায়া)

– ঠিক বলেছিস চল। এই নে রং তুলি নিয়ে উপরে যা আমি রজতদা আর রমেনদাকে ডাকি আমায় বলেছিল সাহায্য করবে। (উমা)

''আচ্ছা'' জয়ন্তিকা আর মায়া উমার হাত থেকে রঙ তুলি গুলো নিয়ে উপরের হল ঘরে চলে এলো।

ঘরটার একদিকের দেওয়ালে টাঙানো হোয়াইট বোর্ড আর তার পাশে রাখা টেবিলের উপর পড়ে থাকা মার্কার, বই গুলো এখানে টিউশন পড়ার প্রমাণ দেয়।

ঘরের মেঝের কিনারা দিয়ে আল্পনা দিতে শুরু করে দেয় জয়ন্তিকা আর মায়া। আগের বছরের আল্পনার উপরেই তুলি বোলায় কারণ অ্যাক্রেলিক রঙে দেওয়া আল্পনাগুলো জল মুছে যায়নি, শুধু হাল্কা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উমা রজত আর রমেনকে নিয়ে চলে আসে। পাঁচজনে মিলে ফিকে হয়ে যাওয়া আল্পনার পরে নতুন রঙে তুলি ডুবিয়ে পোঁচ দিতে থাকে।

আর একটু সন্ধ্যা হতেই ক্লাবের আরো অন্যান্য সদস্যদের আগমন ঘটে। নিচের তলার গেটের সামনে সবাই দাঁড়িয়ে আছে কারণ নিচের ঘরটা মোছার কাজ চলছে। না মুছে তো আর আল্পনা দেওয়া যায় না। তুলনায় একটু বয়স্ক অচিন্ত্য বাবু সবাইকে দেখে আর ক্লাবের ছেলে দীনেশকে ঘর মুছতে দেখে চুপ থাকতে পারেন না।

– ''হ্যাঁ রে দীনেশ তুই মুছিস কেন ? এই সপ্তাহে মুছে দিয়ে যায়নি কাজের বৌ টা ?

– ''তা নয় কাকু। আসলে আল্পনা গুলো ঠিক হবে তাই উমা ওর বন্ধুদের নিয়ে এসেছে। আমরা একটু কাজ কমিয়ে দিলাম।'' কথা গুলো বলে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে দীনেশ।

ক্লাবে কাজ হচ্ছে বসার জায়গা নেই দেখে বেশিরভাগ বাজারের দিকে বেরিয়ে যায়। হাজার গল্প করতে করতে উপরে আল্পনা দিয়ে নেমে আসে উমা, জয়ন্তিকা, মায়া, রমেন, রজত। নিচের ঘরেও আল্পনা দিতে লেগে যায়। ক্লাবে বেশি কেউ নেই ওরা পাঁচ জন, দীনেশ আর অচিন্ত্য বাবু ছাড়া।

সৌমেন আর দিনেন্দ্র বাবু ক্লাবে ঢুকে এরকম সাজো সাজো রব দেখে একটু অবাক হন।

– ''কি রে উমা, মায়া, জয়ন্তিকা তোরা ক্লাবে ? হঠাৎ আল্পনা দেওয়া হচ্ছেই বা কেন ?'' দীনেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করেন।

– ''সামনে তো বৈশাখী তাই বাবা বলল আল্পনা দিয়ে যেতে। প্রতি বছরই তো দিই, আফসোস এবছরও অনুষ্ঠান হবে না।'' বললো উমা।

– ''ওহ আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। ভালো করে আল্পনা দে। অচিন্ত্য টিভিটা চালাও তো।'' দীনেন্দ্র বাবু একটা চেয়ার নিয়ে টিভি দেখতে বসে পড়েন। আর সৌমেন মুখটা কালো করে চুপ করে বসে থাকে, যেটা সকলের চোখে পড়ে।

টিভি মানেই দীনেন্দ্র বাবু, অচিন্ত্য বাবুদের কাছে খবরের চ্যানেল। খবরের চ্যানেল চালাতেই চারিদিকে করোনা, ভোটের প্রচার, খুন জখম, মারামারির খবর ভীড় করে আসে। উমাদের বিরক্ত লাগলেও কিছু বলতে পারল না। হঠাৎ করোনা কালে রক্তের অভাবের কথাটা দেখাতে দীনেন্দ্র বাবু চুপ থাকতে পারলেন না।

– ''গেল বছর করোনার জন্য রক্তদান শিবিরটা করা হলো না, আর এবছর যা শুরু হয়েছে এবারও হবে বলে মনে হয় না। আবার লকডাউন হলে মানুষের চলবে কি করে ?'' দীনেন্দ্র বাবুর গলার স্বরে কিঞ্চিত বিষণ্ণতা।

করোনা নিয়ে আরও নানান সমস্যার কথা উঠে এলো ধীরে ধীরে। তবে পুরো সময়টায় সৌমেন কিছু বলল না।

– সৌমেনদা কিছু কি হয়েছে তখন থেকেই চুপ করে আছো ? দীনেশ জিগ্যেস করে।

দীনেশের কথা শুনে সৌমেন আর চুপ থাকলো না ''কি আর বলি বলত, মেয়েটা বায়না ধরেছে নতুন জামা কিনে দিতে হবে। ঢালাইয়ের কাজের অবস্থা তো জানিস, সংসারই চলছে না আবার নতুন জামা ! মেয়ে তো শুনছেই না জেদ ধরছে ওর সব বন্ধুদের নাকি নতুন জামা হয়েছে।''

সৌমেনের কথা শোনার পর সবাই চুপ করে গেল। একটা পিন পড়লেও শব্দ পাওয়া যাবে এত নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। এখানের কেউই সেরকম বড়লোক নয়। সবাই মধ্যবিত্ত তাও সকলে মিলে ক্লাব থেকে লোকজনকে সাহায্য করে। জয়ন্তিকা, মায়া আর উমা নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করে নিল।

নকল কেশে গলাটা পরিষ্কার করে উমাই শুরু করল ''আমি বলছিলাম কি এবারের রক্তদান শিবিরটা যদি পয়লা বৈশাখের দিন করা হয় ? না মানে আমি শুধু সাজেশন দিচ্ছি। এমনিতেই প্রতিবছর রক্তদান শিবিরে নানান ভাবে মানুষদের সাহায্য করা হয় সেটাই যদি করা হয় এই পয়লা বৈশাখেই।''

– কথাটা মন্দ নয় তবে এত কম সময়ে এত আয়োজন আর অনুদান ছাড়া তো কিছুই সম্ভব নয় ? রজত বলে।

– তাছাড়া ভ্যাকসিনেশন এখানে সম্পূর্ণ ভাবে শুরু হয়ে গেলে রক্তদানে বাধা থাকবে বেশ কিছুদিন। সেক্ষেত্রে এখন কোনো ভাবে রক্তদান শিবিরটা আয়োজন করতে পারলে ভালোই হবে। দীনেশের বক্তব্য।

– ''ওরা এখনও ছোট। সবে সবে কলেজ গেছে। এখন ওরকম অনেক কিছুই বুদ্ধি আসবে কিন্তু আমরা বড়রা ওদের কথায় নাচলে চলে না।'' অচিন্ত্য বাবুর কথায় সবাই দমে গেল।

তবে মায়া দমে যাওয়ার মেয়ে নয়। অনেক মহিলাই এই ক্লাবের সদস্যা, তাদের দেখেছে কিভাবে নিজের বক্তব্যটা জোর করে হলেও সবার সামনে এনেছে, তাই মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল ''জেঠু মানছি আমরা ছোট তাও বলছি আমাদের পুরো কথাটা একবার শুনে দেখুন তারপর না হয় বাতিল করে দেবেন।''

দীনেন্দ্র বাবু আর অচিন্ত্য বাবু তাচ্ছিল্যের হাসি দিলেন।

– আচ্ছা বলো শুনি। শোনো দীনেন্দ্র আজকালকার ছেয়েমেয়েরা কি বলে। অচিন্ত্য বাবু বললেন।

মায়া বেশ গুছিয়ে বলল নিজেদের পরিকল্পনাটা ''দেখো আগের বছরে রক্তদান শিবিরটা হবে বলেও করা সম্ভব হয়নি। তার কিছু অর্থ তো ক্লাবের অ্যাকাউন্টে আছে সেটাই আমাদের সম্বল। তারপর এখন তো সব অনলাইন তাই আমরা ছোটরা যারা ভালো মোবাইল চালাতে জানি তারা খবরটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেব ফোনের মাধ্যমে। কিছু মানুষের থেকে অর্থ সাহায্যও পাওয়া যাবে অনলাইনে প্রচার করলে। ক্লাবের বড়রা রক্ত নেওয়ার জন্য হসপিটালে যোগাযোগ করে নেবেন। আর ক্লাবের সদস্যদের চাঁদা তো আছেই। সেই সব দিয়েই স্বাস্থ্যবিধি মেনে রক্তদান শিবিরটা হবে আর কিছু দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করা হবে। আর বাকি অনুদান আপাতত সঞ্চয় করে রাখা হবে। লকডাউন শুরু হলে কিছু কিছু পরিবারকে খাদ্য দিয়ে সাহায্য করা হবে। তার সাথে অনুষ্ঠানের দিন করোনা মহামারীর স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হবে। পুরো ব্যবস্থা আর অনুষ্ঠান কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে করতে হবে।''

মনে মনে উমাদের প্রশংসা না করে পারলেন না দীনেন্দ্র বাবু, অচিন্ত্য বাবু। একবছর ধরে এই বেহাল অবস্থায় শুধু ভেবেছেন মানুষকে সাহায্য করলে হয়, সাহায্য করলে হয়, তবে ওই ভাবার পর পরিকল্পনাটা আর বাস্তবায়িত হয়নি। সেখানে সবে কলেজে ওঠা একরত্তি মেয়েটা সব ভেবে ফেলেছে কিভাবে কি করতে হবে আবার ওনাদের চুপ করিয়ে নিজের বক্তব্যটাও সকলের সামনে বলে দিল।

– আচ্ছা কাল সকাল আটটায় এটা নিয়ে মিটিং হবে। হাতে মাত্র সাতদিন তাও আবার আজকের দিনটা চলে গেল। পরিকল্পনাটা ভালোই এবার কাল সবটা আলোচনা হবে। দীনেন্দ্র বাবু বললেন।

– এই উমা, জয়ন্তিকা, মায়া ঘরে যা আটটা বাজে এতক্ষণ তোদের ক্লাবে থাকা ভালো দেখায় না। বললেন অচিন্ত্য বাবু।

আর কথা না বাড়িয়ে ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসে জয়ন্তিকা, উমা আর মায়া। বেশি কিছু বললে যদি পুরো ব্যাপারটা বাতিল হয়ে যায় সেই ভয়েই আর কথা বাড়ায় না ওরা।

– আজ যখন নিজেদের কথাটা বলতে পেরেছি একদিন ঠিকই ক্লাবের নামটাও বদলাতে পারব কি বলিস ? মায়া দাবি করে জোরালো কণ্ঠে।

– আমি তো ভেবেছিলাম আমাদের কথা কেউ শুনবেই না। বাঁচা গেল শুনেছে শেষ পর্যন্ত। বলে জয়ন্তীকা।

– এবার টার্গেট ক্লাবের নামটা পাল্টানো, নামের জন্য এলাকার একজন মুসলিমও আসে না, তবে কেউ কিন্তু ক্লাবের কাজকর্মকে অসম্মান করে না। ওরকম রক্ষণশীল নামের জন্য নিজেদের আটকে রাখে। বাবাও চায় নামটা এবার বদল হোক তবে ওই জেঠুদের জন্য কিছু করতে পারে না। উমা ভাবে।

– দেখাই যাক আর কতটা কি করতে পারি আমরা। মায়া বলে।

পাড়ার মোড়ে আসতে তিন বন্ধু নিজের নিজের বাড়ির রাস্তা ধরল।

পরের দিন সকালে মোটামুটি ক্লাবের সব সদস্য নিয়ে মিটিং হয়ে গেল। গৌতম বাবু, মৈনাক বাবু আর সৌম্য বাবু নিজের মেয়েদের নিয়ে বেশ গর্বিত বোধ করলেন। সবাই উমা, জয়ন্তিকা, মায়ার পরিকল্পনাটাই মেনে নিয়েছে। সকলেই জোর কদমে লেগে পড়েছে পয়লা বৈশাখেই রক্তদান শিবিরটা করার জন্য। ক্লাবের নামটা পরিবর্তনের কথা উঠতে একপ্রস্থ বচসা হয়ে গেছে তবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, ক্লাবের নেমপ্লেটটা খুলে রাখা আছে শুধু।

সৌমেন, রজত, রমেন, দীনেশ সহ আরও ক্লাবের ছেলেরা প্রত্যেকেই নিজেদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে রক্তদান শিবিরের ব্যাপারটা প্রচার করে দিয়েছে। সকল নিয়মবিধি, নিয়মাবলী ভালো মত করে বুঝিয়ে একটা পোস্ট করেছে, আর সেটাই সবাই মিলে শেয়ার করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

দেখতে দেখতে দিন কেটে গেল আর এসে গেল পয়লা বৈশাখ। রক্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য হসপিটালের সাথে যোগাযোগ করতে একটু বেগ পেতে হলেও সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে। তাছাড়া সব থেকে ভালো কথা অনলাইনে বেশ ভালো সাহায্য পাওয়া গেছে, এলাকার মানুষ ছাড়াও অন্য এলাকার বহু মানুষ গুগল পে, ফোন পে এরকম অনলাইন মাধ্যমে অনুদান পাঠিয়েছে। মানুষ এগিয়ে এসেছে মানুষকে সাহায্য করতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে।

দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে রক্তদান মিটে যেতে সকল ডাক্তার, ক্লাবের সদস্যদের মিষ্টি বিতরণ করা হলো। কথা মত কিছু দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্যও দেওয়া হল। আর লকডাউন হলে মানুষের পাশে থাকার প্রতিজ্ঞা করেছে সদস্যরা। এছাড়াও মাস্ক, স্যানিটাইজার বিতরণ সহ করোনা সচেতনতা নিয়ে বিস্তর বোঝানো হয়েছে।

সব শেষে অচিন্ত্য বাবু, দীনেন্দ্র বাবু আর ক্লাবের সব সদস্যদের হয়ে সবার থেকে বয়স্ক যামিনী বাবু কিছু বলবেন বললেন।

– ''পয়লা বৈশাখের হালখাতা, দোকানে দোকানে গিয়ে মিষ্টি খাওয়া আর এরকমই ছোটো ছোটো রীতিগুলো আজ হারিয়ে যাচ্ছে। তবে এই পয়লা বৈশাখে ক্লাবের তরফ থেকে যেটা বলতে চাই ভনিতা না করে সেটাই বলি। ক্লাবের নাম আর ''হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি" নয় আজ থেকে ক্লাবের নাম ''সমাজ সংস্কার সমিতি"। লকডাউন, করোনা হয়ত মানুষের থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে গেছে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে মানুষই মানুষকে সাহায্য করতে পারে। তাই শরীরের দূরত্ব বাড়লেও মনের দূরত্ব যেন না বাড়ে, মানবিকতা যেন হারিয়ে না যায়। এই অঙ্গীকার নিয়েই শুরু হোক নতুন পথচলা নতুন নববর্ষ! সৃষ্টি হোক নতুন ঐতিহ্য!" বললেন যামিনী বাবু।

কিছুক্ষণ সবাই নিশ্চুপ থাকার পর জোরে হাততালি দিয়ে উঠল। জয়ন্তীকা, মায়া, উমার মনে তখনও বেজে চলেছে শেষ কথা গুলো ''শরীরের দূরত্ব বাড়লেও মনের দূরত্ব যেন না বাড়ে, মানবিকতা যেন হারিয়ে না যায়!"

'ইচ্ছে শক্তির উপর ভর করে, নিজের উপর বিশ্বাস রেখে নির্ভীক ভাবে কঠোর পরিশ্রম করে যাও, সফল তুমি হবেই'

— *স্বামী বিবেকানন্দ*

পাশের বাড়িটা পুলুদের

অনির্বাণ রায়
চতুর্থ সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (সাম্মানিক)

পুলুদের বাড়ির গায়ে বেশ রোদ এসেছে। সোনালি রোদ। এমন বিকেল ওর বড় ভালো লাগে। গরমটা কেটে গেছে অনেকটা। হাওয়া দিচ্ছে। ছাদের পাঁচিল এর ধারে বসে আছে পল্টু। ওদের বাড়িটা পুলুদের পাশেই। ঐ, আবার কাঠবেড়ালিটা উঁকি দিয়ে গেল। এত করে ডাকল, খাবার দিলো, তাও কিছুতেই কাছে আসতে চায় না। দাদু ঠিকই বলে, কাঠবেড়ালিকে পোষ মানানো খুব শক্ত। অনলাইনে আজ তার ক্লাস হয়নি। স্যারের নেটের কিসব সমস্যা। ৪টে বাজছে হয়ত। বিকেলে ছাদে উঠলে এদিকে পাঁচিলের ধারেই বসে পল্টু। রোদ থেকে বাঁচা তো যায়ই, কেউ ছাদে আসছে কিনা সেটাও বোঝা যায়। কারণ ইদানিং মা বিকেলে ঘুমালে ও ফোনটা চার্জ থেকে খুলে এনে লুকিয়ে লুকিয়ে পাবজি খেলে। পাছে মা জানতে পারে, তাই এই সাবধানতা।

আজ যদিও মা জেগে। বাবাও আছে। ওরা আমহার্স্ট স্ট্রিট না কোথায়, হাঁদুজেঠু নতুন যে বাড়ি কিনেছে, ওখানে যাবে।

পল্টু উঠে পড়ল। নিচে এসে দেখে মা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, বাবা মনে হয় বাথরুমে। ও মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মা বলল, ''কি রে! রেডি হ! কুইক!''

পল্টু একটু ইতস্তত করে বলল, ''আমি যাব না!''

মা মুখে সেফটিপিনটা নিয়ে আঁচল ঠিক করতে করতে বলল, ''কেন যাবি না ?''

– ''ভালো লাগছে না। তোমরা যাও।''

ইতিমধ্যে বাবা ঘরে এসেছে। সব শুনে টুনে বাবা বলল, ''আচ্ছা শোনো! ও যখন থাকতে চাইছে থাকুক!''

মা বলল, ''কেন ? ও কি করবে না করবে! একা থাকতে পারবে ?''

পল্টুর এবার বেশ রাগ হল। ক্লাস ৬-এ পড়ে সে। মর্নিং-এর ছেলেরা তাকে দাদা বলে ডাকে, আর সে কিনা একা থাকতে পারবে না!

মাকে বলল – আমি বড় হয়ে গেছি, আমি একাই থাকতে পারব!

বাবা ওর দিকে ফিরে একটু হাসল। বলল, ''আচ্ছা একটা প্রশ্নের উত্তর দে তো। তাহলে মেনে নেব তুই সত্যি বড় হয়ে গেছিস!''

– কি বলো ?

– কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানে কি ?

– অ্যাঁ ?

– কি হল পারবি না ?

ঢোক গিলতে গিলতে পল্টু বলল – ধ্যাত, এত শক্ত প্রশ্ন করলে তো বলা শক্ত!

বাবা হেসে উঠল। মায়ের দিকে ফিরে বলল – ''যাক ওকে একাই থাকতে দাও, এমনিতেও বাইরের যা অবস্থা ওর না বেরনোই ভালো।''

আধঘন্টা বাদে একটা উবের করে মা আর বাবা বেরিয়ে গেল। বারন্দা থেকেই পল্টু হাত নাড়ল। যদিও দরজা খোলা রাখল কেনো, বুঝল না পল্টু। এসব ক্ষেত্রে তো ওরা তালা দিয়ে চাবি নিয়ে চলে যায়। এবার কি হল!

এসব ভাবতে ভাবতে পল্টু ঘরের দিকে যাচ্ছে, কি একটা শুনে পেছন ফিরে দেখে সেই কাঠবেড়ালিটা। ওর দিকে তাকিয়ে। হাসছে যেন। তবে রে! বলে তেড়ে যেতেই, তিড়িং করে লাফিয়ে কোথায় পালালো। ভালো একটা জিনিস কিন্তু হয়েছে। মা ফোনটা রেখে গেছে। পল্টু ঘরে এসে ফোনটা তুলে খেলতে বসল। আহা, ফাঁকা বাড়ি, কেউ কোথাও নেই, ভয়েরও কোনো কারণ নেই। কিন্তু তার আগে একটা কাজ সেরে নেওয়া দরকার। বাবা এলে, বেশ চমকে দেওয়া যাবে। গুগল খুলে পল্টু 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়'-এর মানেটা দেখে নিল। এই তো! আর কে আটকায়! এবার আরাম করে বসে ১৫-২০টা প্লেয়ার মারা যাবে। কিন্তু হেডফোনটা কোথায় গেল ? ইস! হেডফোনটা না থাকলে তো জমবে না। পল্টুর মনে পড়ল যে পিছনে ঠাম্মার ঘরে শোকেসের উপর হেডফোনটা রাখা। কিন্তু...! কিন্তু সে জায়গাটা যে খুব অন্ধকার! বাড়ির ওই দিকটা পিছনদিক হাওয়া আলো ঢোকে না বললেই চলে। পল্টু বলেছিল বটে যে ও বড় হয়ে গেছে, কিন্তু সত্যি বলতে এসব ক্ষেত্রে ওর হাঁটু কাঁপে। তারপর আবার কিছু মাস আগেই ঠাম্মা মারা গেছে। তাই একটা অদ্ভুত ভয়, না ঠিক ভয় না, একটা অস্বস্তি হয় তার ওই ঘরটার অন্ধকারে গেলে। যদিও একটা পজিটিভ দিক হচ্ছে পল্টুর ঠাম্মি ওকে খুব ভালোবাসত, আর ঠাম্মির তো স্বাভাবিক মৃত্যু। তো ভয় কি ? ঘরের অন্ধকার না কাটলেও, মনের অন্ধকার অনেকটা কেটে গেল। পল্টু বেশ জোরে গান গাইতে গাইতে ওঘরে গেল। শোকেস থেকে হেডফোনটা নিতে যাবে হঠাৎ একটা খট করে শব্দ হল একতলা থেকে। দরজায় খিল দেওয়ার শব্দ।

ওদের নিচের তলাটা একটু সেকেলে। বাড়ির পেছন দিকটায়

একটা ছোট্ট বাগান আছে। মা রোজ সন্ধ্যেবেলা সেখানে তুলসী তলায় প্রদীপ দেয়। পুজোটুজো করে। ওই দিকের অনেকটাই ভাঙ্গাচোরা আর ঝোপ জঙ্গলে ভরা। তাই পল্টু সেখানে বেশি মাড়ায় না। দরজার শব্দ মানে হয়তো কেউ বাড়িতে ঢুকেছে! এখন আবার কে আসবে ? পল্টু ঘর থেকে বেশ জোর গলায় চিৎকার করে উঠলো, ''কে ?'' কোনো উত্তর নেই। ওর গলাটা কেঁপে গেল। ভয় লাগছে। হঠাৎই মনে পড়ে গেল, এইসময় তো কাজের পিসি আসে! সেই এসেছে হয়তো। ভয় টয় কোথায় উবে গেল। হেডফোনটা নিয়ে ঘরে ফেরার আগে একতলার সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো পল্টু। পাঁচ মিনিট হতে চলল কেউ এলোনা কেন ? সিঁড়িটা গিয়ে অন্ধকারে মিশেছে। কনজুরিং-এর সেই বেসমেন্টের মত। এসব অবস্থায় কেন যে ভুতের সিনেমা গুলোর কথাই মনে পড়ে! এটা মনে হতেই আর ওখানে দাঁড়াতে সাহস হল না। যে ঢুকেছে ঢুকুক! পড়ে থাকুক ওই অন্ধকারে! অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে পিছনে হাঁটতে শুরু করল। চৌকাঠে পায়ের ঠোকা লাগতে, পিছন ফিরে ঘরে ঢুকে বিছানায় উঠে পাবজিটা চালিয়ে দিল।

যাহহ! একটু আড়াল থেকে যদি স্নাইপটা করত এভাবে মরতে হতো না। ধুস! ভেবেছিল কভার নিয়ে লোকটাকে মারবে উল্টে ওকেই... আর ভালো লাগে না! আরেক ম্যাচ শুরু করতে যাবে ফোনটা চার্জ শেষ দেখিয়ে নিভে গেল। যাহ! ফোনটাও বন্ধ হয়ে গেল। ব্যস বোর হও। ফোনটাকে চার্জে দিয়ে, বিছানায় এলিয়ে পড়ল। আজকাল সত্যিই আর খেলতে ভালো লাগে না। পুলুও বলছিল, আগে সেও নাকি খুব খেলত, কিন্তু এখন আর নাকি ওর ও ভালো লাগেনা। কেন কে জানে ? সন্ধ্যা নামছে। চারপাশটা বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। আর কিছুক্ষণেই হয়তো বাইরের ল্যাম্পগুলোও জ্বলে উঠবে। বাইরে গাড়ি গেলে তার হেড লাইটের আলো জানলা দিয়ে এসে ধাক্কা খাচ্ছে সিলিং-এ। কেমন ঘুম ঘুম পাচ্ছে ওর। চোখটা বুজে আসছে। হঠাৎ কানটা খাড়া হয়ে উঠল। কিছু একটা ওকে জানান দিল, ও বিপদে পড়বে। বারান্দার দিক থেকে একটা খসখস আওয়াজ আসছে। যেন কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। তবে কি সত্যি তখন কেউ বাড়িতে ঢুকে ছিল ? আর এখন ওর অজান্তে বারান্দায় ঘাপটি মেরে আছে ? কাঠ হয়ে শুয়ে রইল। কি করবে এখন! কাকে ডাকবে! এমন সময় কলিংবেল-এর শব্দ। তড়াং করে লাফিয়ে উঠলো। মাথায় অনেক গুলো চিন্তা দলা পাকাচ্ছে। গলার কাছে ভয়টা এসে জমাট বাঁধছে। তাহলে কি, তাহলে কি ওই লোকটা বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গীকে কিছু সংকেত দিচ্ছে ? আর যখন ও হয়ত দরজা খুলতে যাবে, তখনই ঐ লোকটা ওকে ধরে, হাত পা মুখ বেঁধে, সব লুট করে ভেগে পড়বে! সর্বনাশ! চিন্তায় ছেদ পড়ে। আবার কলিংবেল-এর শব্দ। আর সাথে সাথেই মনে হল যেন পায়ের শব্দটা বারান্দা থেকে ওর দিকেই আসছে। পল্টু আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলো ''কে ওখানে ?'' চ্যাচানিতে আওয়াজটা থেমে গেল। দরজা খুলতে যাবে ? যদি দরজা খুলে সেই লোকটার সম্মুখীন হতে হয় ? তখন? একটা অস্ত্র লাগবে। মনে পড়ল ঠাম্মার ঘরে ঠাকুরদার একটা মোটা লাঠি আছে। কিন্তু আবার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। পল্টু ছক কষল। যদি দৌড়ে যায় তাহলে দু সেকেন্ডেই পৌঁছে যাবে, কিন্তু বারান্দার লোকটা যদি পিছু ধাওয়া করে ? পল্টু দরজায় এসে দাঁড়াল। এখানেই বেশ অন্ধকার। পল্টু মনে মনে গুনল, তিন... দুই... এক! বলেই দৌড় মারল ঘর লক্ষ্য করে! ওই হয়তো লোকটা আসছে! এই ধরে ফেলল! ধরে ফেলল! ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে হাঁফাতে লাগলো! উফ! খুব বাঁচান বেঁচেছে। একটু ধাতস্থ হয়ে হাতে লাঠিটা তুলে নিল। লাঠির সাথে সাথে সাহসটাও উঁচিয়ে ধরল। আয় কে আসবি! আয়! দরজা খুলে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। না কেউ নেই। ক্লিয়ার! প্যাসেজ-এর আলো জ্বালিয়ে সোজা গেল বারান্দায়। বারান্দা খালি। ওই আবার বেল বাজলো। দেখা যাক কোন বাবাজি এসেছে! মেরে তক্তা করে দেবো। স্কুলে, অভ্রর কথা মনে পড়ে গেলে। কি মারটাই না খেয়েছিল ওর হাতে। লাঠি হাতে নেমে গেল একতলায়। সুইচ দিতে টিমটিমিয়ে বাল্বটা জ্বলে উঠলো। এবার আসল পরীক্ষা! একহাতে ছিটকিনি আর এক হাতে লাঠি ধরে দাঁড়ল পল্টু! দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে! খুলবে... খুলবে... এই খুলবে... এই খুলবে... এবার... এই খুলল... এইবার... এইবার... টান মেরে দরজাটা খুলে ফেললো।

ঠাকুর মশাই আপনি ?

ঠাকুর মশাইও যথারীতি হতবাক। অপ্রস্তুত। এটা আশা করেননি। বলে উঠলেন, ''হাতে ওটা নিয়ে কি করছো ? ভয় টয় পেলে নাকি? আর এত দেরি হলো দরজা খুলতে ?'' এবার প্রচন্ড লজ্জা পেল পল্টু। ছি! ছি! মাথায় এইটুকুও আসেনি যে এই সময় ঠাকুরমশাই আসেন। যাক সত্যি কথাটা বলা যাবে না। ভীতু ভাববেন। মুখে বলল ''না না মনে ওই একটা বেড়াল, বেড়াল খুব জ্বালায় তাই, তাই আরকি...!'' ঠাকুর মশাই একটু হাসলেন। ভিতরে ঢুকে জুতো খুলে দুতলার দিকে যাচ্ছেন, পল্টু দেখল বিপদ! আবার একা ফিরতে হবে! বলল ''আপনি একটু দাঁড়ান আমিও আপনার সাথে যাব।'' দরজা বন্ধ করে তার পেছন পেছন চলল। মনে মনে ভাবল, নিচে একা থাকার চেয়ে ঠাকুর ঘরে থাকাই ভালো। বসল গিয়ে সেখানে। ঠাকুর মশাই পুজোতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পুজো দেখছে কিন্তু বিরক্তিও লাগছে। মাথায় একটা কথাই ঘুরছে ওটা কি তাহলে সত্যি সত্যি ভুত ছিল যার আওয়াজ শুনল ? কাউকে তো কোথাও দেখল না! আর চেপে রাখতে না পেরে ঠাকুরমশাইকে বলল, ''ঠাকুরমশাই ?''

– হ্যাঁ বলো

– ভূত বলে কিছু হয় ?

কিছুক্ষণের জন্য সব চুপ।

– তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো ?

এ প্রশ্নের আশা ও করেনি। ঢোক গিলে বলল, ''না মানে সেরকম ভাবে...''

– তাহলে ভূতেও করো না!

কিছুক্ষণের জন্য ভাবল পল্টু। তারপর বলল, ''আর যদি ভগবানে বিশ্বাস করি ?''

ঠাকুরমশাই ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। বললেন, ''তাহলে ভূতেও করো''।

ঠাকুরমশাইকে বিদায় জানিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল পল্টু। মনটা খচখচ করতে লাগলো। আবার ও একা। ঠাকুর মশাই যা বলল, তাতে ভূত আছে। আর ও তাহলে ভূতের শব্দই পেয়েছে। সব ভুতুড়ে সিনেমাগুলোর কথা মাথায় ঘুরতে লাগল। গল্পগুলোর কথা। যদিও ভয়ের অত কিছু নেই। হাতে এখনো লাঠিটা আছে। কিন্তু ভূতকে কি আর লাঠি দিয়ে মারা যায় ?

চিন্তা আর ভয়ে মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। সন্ধ্যা নেমেছে। চারপাশ পুরোপুরি অন্ধকার। পল্টুর আর ভালো লাগছে না। লাঠি হাতে ও সিঁড়ির দিকে এগোলো। সিঁড়ির আলো জ্বালাই ছিল। কিন্তু সিঁড়ির কাছে পৌঁছোতেই আলোটা গেল নিভে। থমকে দাঁড়ায় পল্টু। ওপরটা পুরো অন্ধকার। একতলার এই টিমটিমে আলোটাই এখন সম্বল। আর থাকতে পারল না। চোখ ছলছল করে উঠল। এই একা একতলায় ও থাকতে পারবে না। উপরে যেতেও পারবে না। ঐ! খসখস করে একটা আওয়াজ! কেউ একটা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে। কেঁদে ফেলল পল্টু। আস্তে আস্তে শব্দটা আরো নিচে নামছে! কাছে আসছে! পল্টুর পিঠ গিয়ে ঠেকেছে দরজায়। ধপ করে বসে পড়ল। ''আর না ভগবান! আমাকে বাঁচাও! আমি সাহসী নই! আমি আর কোনদিন কিছু করব না!'' হাঁটুতে মুখ গুজে কাঁদতে লাগল। সিঁড়ির বাঁকের কাছে এসে শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। কি আছে ওখানে! কাকে দেখবে! কি অপেক্ষা করছে ওর জন্য! এই হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়বে!

ঠিক এইসময় কলিং বেল বেজে উঠল, আর দরজায় টোকা। শেষ সম্বলটুকু আঁকড়ে ধরতে চাইল পল্টু। উঠে হুস করে দরজা খুলে ফেলল।

বাবা আর মা বাইরে দাঁড়িয়ে। তারাও বেশ অবাক। পল্টু গিয়ে জড়িয়ে ধরল মাকে। বলল, ''আমি আর কোনোদিন একা থাকব না।! তুমি বলো যেখানেই যাবে আমাকে নিয়ে যাবে! আমার খুব ভয় লাগছে!'' কথা বলছে আর কাঁদছে। মা ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করল, ''কেন ? কি হয়েছে ? ভয় পাচ্ছিস কেন?''

– ''ওখানে ভূত আছে! আমার কথা বিশ্বাস করো! ওখানে ভূ...''

ওর বাবা মা একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হো হো করে হেসে উঠল। ''আচ্ছা! বুঝেছি এবার কি ব্যাপার! আয় আমার সাথে'', বলে ওর বাবা ওর হাতটা ধরে নিয়ে চলল ওপরে। পল্টুর তখনও খুব ভয় করছে। কি অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। উপরে উঠে দেখে কেউ কোথাও নেই। সব ফাঁকা। পল্টু একটু ধাতস্থ হলে, বাবা ডেকে উঠলো। ''উমা! এই উমা কোথায় আছিস বেরিয়ে আয়! আমরা এসে গেছি!''

পল্টুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। দেখল ঠাম্মার ঘর থেকে পুলুর বড়দি উমা, খিকখিক করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে। উমা বলল, ''যাক বাঁচা গেল! ওহ! এ যা ভিতু, একলা রাখাই দায়।'' বাবা বলল, ''আচ্ছা আচ্ছা! এবার একটু খুলে বলতো কি হয়েছে!''

উমা যেটা বলল সেটা শুনে পল্টুর রাগ, দুঃখ, ভয় সব একসাথে হল। বলল, ''আরেহ তোমরা তো আমায় দায়িত্ব দিয়ে গেলে এই বীরপুরুষের খেয়াল রাখবার। তো আমি বাড়িতে যখন ঢুকলাম, শুনি ও কাঁপা গলায় চেঁচাচ্ছে। বুঝলাম ব্যাটা ভয় পেয়েছে। তাই আর নিজেকে সামলাতে পারিনি। ভয় দেখিয়েছি।'' এই বলে একটা দুষ্টুমির হাসি হাসলো উমা।'' ওর মতো সাহসী ছেলে তো এতটা ভয় পেয়ে যাবে ভাবতেও পারিনি।'' বাবা মা উমা তিনজন মিলে সে কি হাসি। মা বলল, ''দেখলাম তুমি কত বড় হয়েছ! যাও! অনেক করেছো। গিয়ে হাত পা মুখ ধুয়ে এসো। খেতে দেবো। আর এই উমা! চল ঘরে গিয়ে বসবি চল। তোর উপর যা ধকল গেল...''।

তিনজন মিলে ঘরে গিয়ে ঢুকল। পল্টু তখনো সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে, একতলার টিমটিমে আলোটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। পল্টুর মুখ দিয়ে শুধু একটা কথাই বেরিয়ে এল, ''কিংকর্তব্যবিমূঢ়''।

পার্ফেক্ট ক্রাইম

শুভজিৎ চ্যাটার্জী
চতুর্থ সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (সাম্মানিক)

রবিবারের সকাল, সেমিস্টারও শেষ তাই পড়াশোনার চাপ নেই বললেই চলে, তাই সময় কাটাতে আমার প্রিয় জায়গাতে বসে আছি, আমার দাদার অফিস যদিও বাড়ির নিচের তলাতেই কিন্তু তাও এটা আমার খুব পছন্দের জায়গা। একটু ফাঁকা সময় পেলে এখানে চলে আসি। দাদার অসংখ্য বইয়ের সম্ভার থেকে কিছু বই পড়ি বা ক্লায়েন্ট এলে দাদার সাথে তাদের কথা শুনি। আজও স্বভাববশতই একটি বই নিয়ে বসেছি, দাদা উপরে গেছে টিফিন করতে, হঠাৎই এক ভদ্রলোক এসে হাজির। দেখে মনে হলো বয়স প্রায় ষাট টপকেছেন, পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। পাঞ্জাবিটা ঘামে পুরোপুরি ভিজে রয়েছে। দেখেই মনে হচ্ছে খুবই ক্লান্ত। হয়তো ঠিকানা খুঁজতে অসুবিধা হয়েছে। রুমাল দিয়ে কপালের, মুখের ঘাম মুছতে মুছতে এসে বসে পড়লেন সামনের চেয়ারটাতে। আমি একটু অবাক হলাম যে বলা নেই কওয়া নেই দিব্যি এসে বসে পড়লেন, মনে মনে একটু রাগও হল এই ভেবে যে আমাকে হয়তো ধর্তব্যের মধ্যেই রাখলেন না। তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করতে যাবো এমন সময় তিনি নিজেই খুব ধীর গলায় বললেন, ''একটু জল পাওয়া যাবে ?'' আমি বললাম, ''হ্যাঁ একটু বসুন আনছি।'' এই বলে ভিতর থেকে এক গ্লাস জল এনে তাকে দিলাম। এক নিঃশ্বাসে এক গ্লাস জল শেষ করে যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে একটু অবিশ্বাসের সুরেই জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনিই প্রজ্ঞান ব্যানার্জী! মানে আমি তো শুনেছিলাম... ''কথা শেষ হওয়ার আগেই পিছন থেকে একটা অতিপরিচিত গম্ভীর স্বরে ভেসে এলো, ''না, ও নয় আমি প্রজ্ঞান ব্যানার্জী।'' পিছনে ঘুরে দেখলাম সিগারেটে টান দিতে দিতে ঘরে ঢুকলো দাদা। ভদ্রলোক একটু আমতা আমতা করেই বললেন, ''ইয়ে না মানে আমি আসলে ওনাকে...'', ''হ্যাঁ বুঝেছি'' টেবিলের উপর রাখা আজকের খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে বললো দাদা। ''হ্যাঁ, আপনার নাম অনেক শুনেছি মি. রায়-এর কাছে। মৃদু হাসতে হাসতে বলে চললেন ভদ্রলোক। উনিই আসতে বললেন আপনার কাছে, আপনার ডালহৌসির কেসটার কথা তো প্রায় সবাই জানে।''

ও হ্যাঁ আপনাদের তো আমার পরিচয়টাই দেওয়া হয়নি। আমি নিশান মুখার্জী, প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। আর যার কাছে এই ভদ্রলোকের আসা তিনি হলেন আমার পিসতুতো দাদা, প্রজ্ঞান ব্যানার্জী, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, বয়স ওই তেত্রিশের দোরগোড়ায়। পিসি, পিসেমশাই-এর ট্রেন এ্যাক্সিডেন্টের পর দশ বছর বয়স থেকে আমাদের বাড়িতেই মানুষ। কি ফেলুদার সাথে মিল খুঁজছেন? একটু মিল থাকলেও পুরোটা মিল নেই। যদিও আমি আমার দাদাকে ফেলুদা হিসাবেই ভাবতে ভালোবাসি আর নিজেকে তোপসে। সে যাই হোক আমার এই দাদাটি দীর্ঘ সাত বছর লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এই কয়েকমাস আগেই চাকরি ছেড়ে বাড়িতেই অফিস খুলে বসেছে। তার কথায় সে নিজের কাজের শেষে কারো কাছে রিপোর্ট করতে পারবে না। তার কাজের উপর কারো তদারকি তার পছন্দ নয়। আবার বরং মূল ঘটনায় ফিরে আসি।

''আমার নাম অবনী বাগচী। আমার একটা প্রিন্টিং প্রেস আছে উত্তর কলকাতায়। বেশ ভালোই চলে। অনেক নামী দামী বই আমাদের প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে। আমার বাড়ি মানিকতলায়, চালতাবাগান। সৌরভ আর গৌরব আমার দুই ছেলে... ছিল'' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন ভদ্রলোক। দাদা আমাকে ইশারা করলো আর এক গ্লাস জল দেওয়ার জন্য। তিনি আবার একটু জল খেয়ে, নিজেকে একটু সামলে নিয়ে রুমালে চোখ মুছে বলতে শুরু করলেন, ''আজ থেকে ঠিক কুড়ি দিন আগে প্রেস থেকে ফেরার পথে আমার বড়ো ছেলের এ্যাক্সিডেন্ট হয়, তৎক্ষণাৎ মারা যায় আর তার ঠিক পনেরো দিন পর মানে আজ থেকে পাঁচ দিন আগে আমার ছোট ছেলের, কলেজ থেকে ফেরার পথে ঠিক একই ভাবে এ্যাক্সিডেন্ট হয়। আজ পাঁচ দিন ধরে সে হসপিটালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে, বাঁচার চান্স কম। এসব দেখে আমার স্ত্রীর ও একটা মাইল্ড হার্ট এ্যাটাক হয়।'' এক টানে বলে তিনি থামলেন। দাদা এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞেস করল, ''তা আপনার স্ত্রী ও কি হসপিটালে ?'' ''আজ্ঞে কালই ছাড়া পেয়েছে।'' ''তা এখন তিনি তো শয্যাশায়ী নিশ্চয়ই, তাহলে তাঁর কাছে কে রয়েছে এখন ?'' জিজ্ঞেস করল দাদা। ''আজ্ঞে আমার বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে সেই দেখাশোনা করছে'' উত্তর দিলেন ভদ্রলোক। এ্যাসট্রে-তে ছাই ফেলতে গিয়ে টেবিলের উপর রাখা অবনীবাবুর হাতে কিছু একটা লক্ষ করলো দাদা। ''পুলিশ এ ব্যাপারে তদন্ত করছে তো নিশ্চয়ই'', দাদা বললো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবনী বাবু বললেন, ''হ্যাঁ করছিল। তদন্তে পাওয়া যায় যে গাড়ির ব্রেক ফেল করেছিল।'' ''আর ছোট ছেলের বেলায় তদন্ত হয়নি ?'' জানতে চায় দাদা। ''নাহ ওর alcoholic টেস্ট হয়েছিল যাতে জানা যায় সে নাকি সেদিন ড্রিংক করেছিল'' বলে চললেন অবনী বাবু, ''কিন্তু বিশ্বাস করুন মি. ব্যানার্জী আজ পর্যন্ত কোনোদিন আমার ছোট ছেলে এক ফোঁটাও মদ মুখে দেয়নি...। মি. রায় বললেন তাই আপনার সাথে যোগাযোগ করতে। আমার যা ক্ষতি

হওয়ার তো হয়েছে আমি চাই এটা যদি কেউ intentionally করে থাকে সে যেন...'' বলতে বলতেই হঠাৎ তাঁর ফোন বেজে উঠে। ফোনটা ধরেই খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত স্বরে তিনি বলে উঠেন ''কি! কি করে! কেউ এসেছিল ? আচ্ছা আমি আসছি এখুনি। তুই একবার ডাঃ সেনকে ফোন করে আসতে বল'' বলে ফোনটা রেখেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আমরাও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, দাদা কি হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে তিনি যা বললেন তার সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে তাঁর স্ত্রী কিছু একটা দেখে খুব ভয় পেয়ে বিছানা থেকে পড়ে যান। অবনী বাবু নমস্কার জানিয়ে বললেন, ''আজ আসি বুঝতেই তো পারছেন...।'' দাদা তাঁর কাছে গাড়ি আছে কিনা জানতে চাওয়াতে তিনি অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ালে দাদা বললো ''আমরাও যাচ্ছি আপনার সাথে। আমাদের গাড়ি আছে। আসুন।'' তিনি গাড়িতে উঠে বিনয়ী সুরে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। চালতাবাগানে একটা তিনতলা চকমেলান বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাতে বললেন অবনীবাবু। নামতে যাবো এমন সময় দারোয়ান এসে জানালো যে, ''মেমসাব কো ডাক্তারবাবু নে হাঁসপাতাল লেকের গ্যায়ে হ্যায়''। দাদা গাড়ি ঘুরিয়ে চললো ESI-এর দিকে। পৌঁছে ডাঃ সেন-এর সাথে দেখা করলাম আমরা। ডাঃ সেন-এর কথা মিসেস বাগচী এমন কিছু দেখেছেন বা শুনেছেন যাতে তিনি এতোটা ভয় পেয়ে যান। বাকি কিছু কথা শেষ করে বেরিয়ে আসতে আসতে দাদা অবনীবাবুকে বলেন যে সে একটু তাঁর বাড়ি যেতে চায়। ''স্বচ্ছন্দে। চলুন। কিন্তু আপনার fees-এর ব্যাপারটা...'' অবনীবাবুকে থামিয়ে দিয়ে দাদা বললো, ''ওসব পরে হবে। আসুন যাওয়া যাক।''

বাড়িতে ঢুকে অবনীবাবু আমাদের একতলায় সোফায় বসতে বলে একটু উপরে গেলেন সম্ভবত ফ্রেশ হয়ে নিতে। যাওয়ার আগে অবশ্য এক মহিলাকে বলে গেলেন আমাদের চা-মিষ্টি দেওয়ার জন্য। কিন্তু প্রায় বারোটা বাজতে যায় তাই আমরা চা খেলাম না। বছর পঁয়তাল্লিশের মহিলাটি মিষ্টি জল আনতে ভিতরে গেল। এতক্ষণ পর দাদাকে একা পেয়ে দীর্ঘক্ষণ চেপে রাখা প্রশ্নগুলো করতে যাবো, আমাকে থামিয়ে দাদা নিজেই একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, ''জানি তোর চারটে প্রশ্ন আছে। তার মধ্যে দুটোর উত্তর এখন পাবি বাকি দুটোর পরে। হ্যাঁ এই মহিলাটিই মিসেস বাগচীর দেখাশোনা করে আর তখন খসখস শব্দটা মি. বাগচীর পা থেকে আসছিল'', এই বলে সামনে ashtray-তে সিগারেটটা নিভিয়ে দিলো। আমাকে কিছু বলতে না দিয়ে নিজেই আমার ভিতরে কি চলছে তা বুঝে ফেলার যে অদ্ভুত ক্ষমতা দাদার রয়েছে তাতে আগে অবাক হলেও এখন আর হইনা। কি করে বুঝতে পারে তা জানতে চাইলে আগে মজা করে বলতো সে আমাকে জন্মাতে দেখেছে তাই আমার ব্যাপারে সব বোঝে। আমিও বোকার মতো সব বিশ্বাস করতাম। এখন যখন কোনো অচেনা ব্যক্তির সম্পর্কেও অনেক কিছু বলে দিতে পারে তখন বুঝি যে এটা তার দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের সাথে মেলামেশা করা আর ভয়ানক observation power থাকার ফল। ওই যে বললাম না যে এসব কারণের জন্যই আমি আমার দাদাকেই real life ফেলুদা ভাবি। যদিও দাদা বলে observation power গোয়েন্দাগিরির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ওটা না থাকলে ডিটেকটিভ হওয়া সম্ভব না। চোখ আর মগজ হলো আসল অস্ত্র এই অস্ত্র ঠিক ভাবে চালাতে জানলে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন হয় না।

সে যাই হোক মিনিট পাঁচেক পর দুই প্লেট মিষ্টি হাতে হাসিমুখে মহিলাটি এসে দাঁড়ালেন। ''সরি, একটু দেরি হয়ে গেল। ইয়ে মানে ডাঃ সেন ফোন করেছিলেন তাই আর কি...'' এই বলতে বলতে মিনিট দশেক বাদে নামলেন অবনীবাবু। দাদা জিজ্ঞেস করলো, ''সব ঠিক আছে তো ?'' অবনীবাবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। এবার দাদা উঠে দাঁড়িয়ে বাড়িটা একটু ঘুরে দেখার আর্জি জানালে তাতে গৃহকর্তার সম্মতি পাওয়া গেল। তিনি নিজেই আমাদের ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন, ''আসুন মি. ব্যানার্জী এটা আমার ঘর'' বলতে বলতে দোতলায় উঠে পূর্বদিকে একটি ঘরে প্রবেশ করলেন অবনীবাবু তারপরে দাদা এবং তার পিছু পিছু আমি। ঘরটা বেশ বড়। কিন্তু খুব বেশি আসবাব নেই ডানদিকে বারান্দার দিকের জানলার পাশে একটা বিশাল পালঙ্ক আর তার ঠিক উল্টো দিকে কোনে একটা কাঠের আলমারি বেশ পুরানো আর তার পাশেই একটা মাঝারি টেবিল চেয়ার আর টেবিলের উপর একটা পুরানো টাইপিং মেশিন। মেশিনটাতে হাত বোলাতে বোলাতে দাদা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গৃহকর্তার দিকে তাকাতে মৃদু হেসে তিনি বললেন ''শুরুর দিকে হাওড়া কোর্টে টাইপ রাইটারের কাজ করতাম তখন এত প্রতিপত্তি টাকা পয়সা নিজের প্রেস হবে ভাবতেই পারিনি। শুরুর দিকের সঙ্গী তো তাই আজও ফেলতে পারিনা। কারোকে কোনো অফিসিয়াল চিঠিপত্র লিখতে হলে এটাতেই টাইপ করি।'' ''তা আপনার স্ত্রী আপনার সাথে এখানে থাকতেন না ?'' জিজ্ঞেস করলো দাদা। ''না আসলে ওর শরীরটা কয়েক বছর যাবৎ খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না, হাই বিপি, ডায়াবেটিস, নার্ভ-এর প্রবলেম বিভিন্ন রোগের রোগী হয়ে পড়েছিল। আমারও ফিরতে দেরি হতো অনেক সময় আবার মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরেও কিছু কাজ থাকতো। বোঝেনই তো একটা প্রেস চালানো তো কম ঝক্কির নয়! তাই যাতে ওর অসুবিধা না হয় আমাকে এই ঘরে উঠে আসতে হলো।'' ''মিসেস বাগচীর ঘরটা তাহলে কোনদিকে ?'' আমিই ফস করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম। দাদা একবার ঘুরে আমার দিকে তাকাতে আমি একটু মিইয়ে গেলাম। অবনীবাবু বললেন ''ওই তো বারান্দাটার ওপারেই।'' সেদিকে যেতে যেতেই দাদা জিজ্ঞেস করলো, ''আপনার স্ত্রীর সাথে কে থাকে তাহলে ?'' ''ওই তো সুমিতা থাকে। যাকে নীচে দেখলেন আর কি'' উত্তরে বললেন অবনীবাবু। মিসেস বাগচীর ঘরটাও বেশ বড়ো আসবাবে ঠাসা। কিন্তু অদ্ভুত একটা জিনিস লক্ষ করে দাদার দিকে তাকাতে দাদা ইশারায় বুঝিয়ে দিল যে সেও দেখেছে সেটা। সেখান থেকে বেরিয়ে উত্তরের দিকে সৌরভ ও গৌরব বাগচীর ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন মি. বাগচী। যেতে যেতে দাদা জিজ্ঞেস করলো, ''আচ্ছা মি. বাগচী বাড়িটা কি আপনার নিজের বানানো ?'' বাড়ির মালিক উত্তর দিলেন, ''না না এটা আমি কিনেছি।'' ''তাহলে তিনতলাটা কি বন্ধ থাকে ?''

আবার মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো আমার কিন্তু এবারে দাদা কিছু বললো না। অবনীবাবু বললেন, ''হ্যাঁ ওখানে প্রেসের পুরানো যন্ত্রপাতি ভাঙাচোরা আসবাব এসবেই ঠাসা তাই বন্ধই থাকে। বড় ছেলের ঘরে একটা কম্পিউটার কিছু বই-এর কিছু কাগজপত্র ছাড়া কিছুই ছিল না সেরকম। তাও কাগজপত্র বলতে ছাপা হতে চলেছে এরকম কোন বইয়ের প্রুফ। সেসব একটু নাড়াচাড়া করতে করতে দাদা জিজ্ঞেস করলো, ''এখন মনে হয় প্রেসের কাজ আপনার বড়ো ছেলেই দেখতো?'' ''আগের বছর graduation complete করার পর বাড়িতে বসেই ছিল আমিই বললাম প্রেসে গিয়ে বসতে'' ছেলের পেনটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বললেন অবনীবাবু। ''তা ইদানিং এমন কিছু হয়েছিল কি যে ও একটু বেশিই smoke করছিল ?'' ঘরের বাকি দুজনকেই অবাক করে আচমকা প্রশ্নটা করলো দাদা, ''হ্যাঁ হয়তো ইদানিং একটু অন্যমনস্কও থাকতো আর বেশিই smoke করতো প্রেসের কাজে মাঝে মাঝে খুব চাপ থাকে আমিও ভেবেছিলাম তাই হয়ত...'' অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন অবনীবাবু। ''আচ্ছা মি. বাগচী আপনার ছোট ছেলে কোথায় ভর্তি আছে বলেছিলেন ?'' ছোট ছেলের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করল দাদা। ''ওই তো বেলভিউতে'' বললেন ভদ্রলোক। এই ঘরে টেবিলের উপর কিছু বই খাতা আর একটা হ্যান্ডিক্যাম রাখা। সেটা হাতে নিয়ে অবনীবাবু বললেন ভিডিওগ্রাফি করতে খুব ভালোবাসতো। কত বয়স হয়েছিল জিজ্ঞেস করতে উত্তর এলো একুশ। দাদা বললো ''তার মানে দুই ছেলের বয়সের বিশেষ ফারাক নেই'' অবনীবাবু বললেন ''না না ওই মাত্র দুইবছর।'' দুই ভাইয়ের সম্পর্ক কেমন ছিল জানতে চাওয়াতে তাদের বাবার তরফ থেকে উত্তর আসে খুব একটা ভালো নয়। এসব কথা বলতে বলতেই আমরা নীচে নেমে আসি। ''আপনারা তাহলে বাড়িতে কজন থাকতেন মোট ?'' দাদা জানতে চাইলো ''আমি, আমার স্ত্রী, দুই ছেলে আর সুমিতা আর ধর্মেন্দার তো বাইরের ঘরেই থাকে।'' উত্তর দেন গৃহকর্তা। হঠাৎই দাদা খুব কাশতে শুরু করে আর প্রায় বমি করে ফেলবে এমন অবস্থা। সেইভাবেই জানতে চাইলো বেসিনটা কোনদিকে আর নিচের তলায় বাথরুম না থাকায় রান্নাঘরের বেসিনের দিকে নির্দেশ করেন অবনীবাবু। কোনরকমে সেদিকে যায় দাদা আমি সাথে যেতে চাইলে বাধা দেয়। কিন্তু মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে আসে। তারপর অবনীবাবুকে বলে যে পরদিন সকাল দশটা নাগাদ তাঁর প্রেসে যাবে আর তিনিও যেন উপস্থিত থাকেন। মি. বাগচীও সানন্দে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন এবং প্রেসের ঠিকানা লিখে দেন দাদাকে। ঘোষ এন্ড বাগচী প্রিন্টিং প্রেস, ৫৯/৮ শ্যামবাজার। তারপর গৃহকর্তাকে নমস্কার জানিয়ে ফিরে আসি আমরা। সারা দুপুর ধরে এবিষয়ে একটা কথাও বলেনি দাদা এমনকি গাড়িতে ফেরার সময়ও না। বিকেলে আমাকে না নিয়েই বেরিয়ে যায় কোথাও একটা, ফেরে প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ। জানতে চাইলে শুধু বললো কাজ ছিল দরকারি। ফেরার সময় মি. বাগচীর ফোন নম্বরটা নিয়ে এসেছিল দাদা। রাত্রি নটা নাগাদ হঠাৎ ফোন করে মি. বাগচীকে বলে যে কাল সকালে দশটা নয় নটা নাগাদ তাঁর প্রেসে যাবে আর সকল কর্মীরাও যেন উপস্থিত থাকে।

পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ কোথাও একটা বেরিয়ে যায় দাদা আর আমাকে বলে যায় ঠিক ন'টার মধ্যে রেডি হয়ে থাকতে। ঠিক নটা পাঁচ নাগাদ গাড়ির হর্ণ শুনে নীচে গিয়ে গাড়িতে উঠে রওনা দিলাম শ্যামবাজারের দিকে। কিন্তু প্রেসের অনেকটা আগেই গাড়িটা পার্ক করে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে কাছের সব দোকানে গিয়ে কি সব কথা বলে প্রায় দশ পনেরো মিনিট পর ফিরে আসে। প্রায় পৌনে দশটা নাগাদ আমরা পৌঁছালাম প্রেসে। অবনীবাবু প্রেসের সামনেই পায়চারি করছিলেন। দেখেই মনে হলো বেশ চিন্তিত। আমাদের দেখেই বললেন, ''এই তো আপনারা। খুব বড় একটা ঘটনা ঘটেছে আবার। কেউ আমার ছোট ছেলেকে নার্সিংহোম থেকে kidnap করেছে।'' ''সেকি, বলেন কি ?'' বেশ অবাক হলো দাদা। মি. বাগচী বললেন আপনারা ভিতরে যান আমি বলে রেখেছি, সবাই আছে, আমাকে একটু থানায় যেতে হবে।'' দাদা বললো ''অবশ্যই। আসুন।'' ভিতরে গিয়ে আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দাদা প্রেসের কর্মীদের সাথে আলাদা করে প্রায় আধঘন্টা কথা বলার পর নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলো। এরপর কোথায় যাবো জানতে চাওয়াতে দাদা বললো ''সোজা বাড়ি। বাড়ি গিয়ে স্নান খাওয়া করে টেনে একটা ভাত ঘুম।'' শুনে একটু রাগই হলো। আমাকে পুরো অন্ধকারে রেখে case solve না হওয়া পর্যন্ত কেউ কি করে ভাতঘুমের চিন্তা করতে পারে কে জানে। আমার দাদাটির এই এক সমস্যা ওর মতো কুঁড়ে গোয়েন্দা আমি দুটো দেখিনি। এটাও একটা কারণ ওর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে, আমি যবে থেকে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছি তবে থেকে একবারও কলেজ স্ট্রিটের দিক মাড়ায়নি দাদা। যাবতীয় বই বিগত দু' বছর ধরে আমাকে দিয়ে আনায় আবার ফেরত পাঠায়। সেই যাই হোক বাড়ি পৌঁছে স্নান করে খেতে বসেছি এমন সময় দাদার ফোনে একটা ফোন আসে। উল্টো দিক থেকে কে কি বলছে জানিনা তবে দাদার উত্তর শুনে বুঝলাম নিশ্চয়ই কোনো threat call, call টা কেটে আবার এসে মাছের কাঁটা ছাড়াতে লাগলো যেন কিছুই হয়নি। বিকেল বেলায় মি. বাগচীকে ফোন করে মিসেস বাগচী আর ছোট ছেলের খবর জানতে চাইলো দাদা আর বললো কাল সকালে তাঁর বাড়িতে যাবে। ফোনটা কেটে শুধু আমাকে বাবা আর মাকে বলল আজ বিকেলে বা সন্ধ্যেতে কোথাও না বেরোতে আর দরজায় লক করে রাখতে যতক্ষণ না সে ফেরে বলেই বেরিয়ে গেল। ফিরলো সন্ধ্যে সাড়ে ছটা নাগাদ। ফিরে নিজের ঘরে চেয়ারটাতে গা এলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে শুধু বললো যে টাকা আর লোভ মানুষকে রাক্ষসের চেয়েও ভয়ঙ্কর বানিয়ে দেয় রে। সারারাত বার বার জানতে চাইলেও আর কোনো উত্তর পাইনি। তবে বুঝতে পারছিলাম যে রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে।

পরদিন সকালবেলা বেরোনোর আগে দাদা কাকে একটা ফোন করে 'বাগচী ভিলা'তে আসতে বললো। চালতাবাগানে আগের দিনের সেই বিশাল তিন তলা বাড়িটার সামনে এসে বুঝতে পারলাম তখন

মি. রায়কে ফোন করেছিল। গাড়ি থেকে নামতেই মি. রায় দাদার সাথে করমর্দন করে বললেন গোটা বাড়ি পুলিশ ঘিরে ফেলেছে আসুন। দাদা বললো একটু দাঁড়ান আরো একজন আসবেন। বলতে বলতেই মি. সেন এসে হাজির। এবার দাদা বলল, ''চলুন এবার যাওয়া যাক।''

ভিতরে ঢুকে আমরা চারজনে চারটি সোফায় বসে পড়লাম। মি. বাগচী আবার সেই আগের দিনের মতোই পা ঘষছেন ও হাত কচলাচ্ছেন। দাদা বলতে শুরু করলো ''আপনার বড়ো ছেলের খুনের ও ছোট ছেলের খুনের চেষ্টার কিনারা করতে পেরেছি সাথে আপনার এক সময়কার বিজনেস পার্টনার সুব্রত ঘোষেরও।'' ''কি কি সুব্রতর খুন মানে সে তো বহু বছর...'' কাঁপা গলায় বললেন অবনী বাগচী। ''হ্যাঁ মি. বাগচী একুশ বছর আগে।'' ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধকে থামিয়ে বললো দাদা, ''যাকে আপনি এই বাড়িরই তিনতলার ওই গুদাম ঘরটাতে আপনার পুরোনো ছাপার মেশিনটা দিয়ে মেরে আপনার বাগানের পিছনের দিকে তুলসী মঞ্চের নীচে পুঁতে দিয়েছেন।'' এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল সেও ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি যার হাত পা একটু আগেও কাঁপছিল, এবার টকটকে লাল চোখে তাকালেন দাদার দিকে, দীর্ঘদিন পর খাঁচা থেকে মুক্তি পাওয়া আহত বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লো দাদার উপর, দাদাও সজোরে ছিটকে দিলো তাকে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে অবনী বাগচী বললেন, ''তোদের অবস্থাও সুব্রতর মতোই হবে, ভেবেছিলাম ভয় দেখালে সরে পড়বি তা নয় আরো তিনজনকে নিয়ে মরতে চলে এলি।'' এর মধ্যেই মি. রায়-এর একটা সিগন্যালে নিচের তলার বসার ঘরটা ভরে গেল সশস্ত্র পুলিশে। আমি এখানে শুধু এক অবাক দর্শক। এতো পুলিশ দেখে এবার একটু দমে গেলেন অবনী বাগচী। শুধু কর্কশ গলায় মি. রায়কে বলল, ''সমর তুই আমার সাথে এরকম করলি, তোকে আমি বন্ধু ভেবেছিলাম।'' সমরবাবু হেসে বললেন, ''আমি একজন পুলিশ আর একজন অপরাধী আমার বন্ধু হতে পারেনা।'' এরপর আবার আমার দাদা বলতে শুরু করলেন, ''মি. বাগচী আপনার আসল ছেলেকে ডাকুন এবার, আমার বিশ্বাস এখন তার বাসস্থান সৌরভের ঘর আর এতক্ষণ সেই আমার দিকে বন্দুক তাক করেছিল সিঁড়ির উপরের ঘুলঘুলি থেকে। আর সুমিতা দেবীই তো আপনার আসল স্ত্রী তাই না ?'' সম্মতি জানালেন অবনী বাবু আর তাঁর ছেলে আর স্ত্রীকে ডাক দিলেন। আমরা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সমরবাবু অবাক জিজ্ঞেস করলেন, ''আসল স্ত্রী আসল ছেলে মানে ? তাহলে এতদিন যাদের এর ছেলে বউ বলে জানতাম তারা কারা ?'' দাদা বলে চললো, ''তারা হলো এই বাড়ির আসল মালিক সুব্রত ঘোষের স্ত্রী ও ছেলে।'' এর মধ্যেই উপর থেকে নেমে আসে অবনী বাগচীর আসল স্ত্রী যাকে আমি একটু আগে পর্যন্ত এবাড়ির পরিচারিকা ভাবতাম, আর তাঁর ছেলে যাকে দেখে মি. রায় অবাক বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে, ''অভিক তুমি !'' দাদা তাঁকে থামিয়ে আবার বলতে থাকে ''অবনীবাবু কিছু ভুল বললে ধরিয়ে দেবেন দয়া করে। ছাপাখানা থেকে যখন বেশ ভালো মতো প্রফিট আসছে তখন অবনীবাবু ফন্দি আটেন তাঁর বন্ধুকে ফাঁকি দেওয়ার। এই বাড়িটা সুব্রত বাবুর পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া এখানেই স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে থাকতেন ইনিও। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে জানতে পেরে একদিন খুব কথা কাটাকাটি হয় দুই বন্ধুর, রাগের চোটে তিনতলার ওই ঘরে ছাপার মেশিনের বিম দিয়ে মাথায় মারেন অবনীবাবু, সাক্ষী ছিল সুমিতা দেবী। তারপর স্বামী শোকে নার্ভের ও হার্টের প্রবলেম দেখা দেয় মিসেস ঘোষের সেই সুযোগ নিয়ে তাকে প্রতিদিন slow poisioning করতে থাকে কিন্তু খুব কম পরিমাণে।'' ''না না মিথ্যে কথা'' চেঁচিয়ে উঠলেন অবনী বাগচী। ''আপনার সেই ডাক্তার বন্ধুটি সব স্বীকার করেছে কিন্তু, কি ডা. সেন ঠিক বলছি তো'' মাথা নিচু করে সম্মতি জানালেন ডাক্তার। এই পর্যন্ত সব তথ্য একটা উড়ো চিঠি মারফত আমার কাছে আসে'' এই বলে থামল দাদা। ''আমি কিন্তু মিসেস ঘোষকে চাইনি মি. ব্যানার্জী। যেহেতু এখনো পর্যন্ত বাড়ি আর যাবতীয় সম্পত্তি ওনার নামে আর মি. ঘোষের উইলমতে সৌরভ ও গৌরবের বয়স একুশ পেরোলেই সেই সম্পত্তির মালিকানা চলে যেত তাদের হাতে। তাই আমাকে অবনী প্রস্তাব দিয়েছিল যে মিসেস ঘোষকে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে তার থেকে উইলে সই করিয়ে নিতে যাতে সব সম্পত্তির মালিক হয় অবনী আর অভিক আর তারপর ওনাকে মেরে ফেলতে। কিন্তু এতে আমার মন সায় দেয়নি কিন্তু নাও বলতে পারিনি এই ভয়ে যদি আমার অবস্থাও সুব্রতর মতো হয়। তারপর গত পরশুদিন মি. ব্যানার্জীকে আমার চেম্বারে দেখে ডিসিশন নেই যে ওনাকে সব কনফেস করবো। বিশ্বাস করুন মি. রায় আমি কোনো উইলে সইও করাইনি উপরন্তু মিসেস ঘোষ এখন অনেকটাই সুস্থ। এযাবৎ যাবতীয় অপরাধের শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু সৌরভ আর গৌরবের ব্যাপারটা কিভাবে আমি কিচ্ছু জানি না।'' জোর হাত করে সবটা বলে থামলেন ডা. সেন। আবার দাদা বলতে শুরু করলেন, ''ছাপাখানায় এক কর্মীর বাবা খুব অসুস্থ জানতে পেরে মি. বাগচী তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে সৌরভের অয়েল ট্যাঙ্ক-এ ফুটো করিয়ে দেয় যাতে বেশ কিছুদূর গিয়ে গাড়ি ব্রেক ডাউন করে। আর পিছনে অভিক একটা মেকানিককে সাথে নিয়ে তাকে ফলো করতে থাকে সম্ভবত গাড়ি ব্রেক ডাউন করলে তারা হেল্প করার নামে গাড়ির ব্রেকের তার কেটে দেয় আর কিছুদুর গিয়েই গাড়ি এ্যাক্সিডেন্ট করে। যেহেতু ইনভেস্টিগেশন-এর চার্জ ছিল অভিকের উপরেই তাই খুব প্ল্যান মাফিক অভিক কেসটাতে মেরিট নেই casual accident case বলে বন্ধ করে দেয়। লালবাজারে দীর্ঘদিন কাজ করার দৌলতে আমারও একটু আধটু সোর্স আছে অভিক বাবু, আমি জানতে পারি accident-এর সময় গাড়িতে তেল খুব অল্প ছিল কিন্তু ট্যাংক ফেটে যায়নি। তাই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম যে তেল শেষ হওয়ার আগেই পাম্পে পৌছানোর জন্য বেশ জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল সৌরভ। আর পরশুদিন সন্ধ্যেবেলায় ডা. সেন-এর থেকে সব শুনে sure হয়ে যাই।'' ''ও সেদিন তুমি ওখানে গিয়েছিলে'' বলে উঠলাম আমি। দাদা সম্মতি সূচক মাথা নাড়লো। ''এবার আসি গৌরবের ব্যাপারে''

একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার দাদা বলতে শুরু করলা, ''সুমিতা দেবী গৌরবকে রোজ টিফিন করে দিতেন সেদিনও দিয়েছিলেন কিন্তু সেদিন ওর জলের বোতলে alcohol মিশিয়ে দেওয়া হয়। আগের দিন রান্না ঘরে ডাস্টবিনে মদের বোতল দেখেই বুঝতে পারি কাজটা বাইরের নয় ঘরেরই কারো।'' ''আমি মেশাইনি বিশ্বাস করুন'' বলে উঠলেন সুমিতা দেবী। ''আপনার স্বামী মিশিয়েছিলো। ''আমি জানি আপনি গৌরবকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসতেন। ছোট থেকে কোলে পিঠে মানুষ করেছেন। আপনার কাছে অন্য জিনিস জানার আছে ওই ব্যাপারে পরে আসছি। হ্যাঁ যেটা বলছিলাম, কোনোদিন ড্রিংক না করার ফলে alcohol-এর এফেক্ট বেশি পরে ওর উপর আর bike accident হয় কিন্তু সৌরভের মতো ওখানেই মারা যায়নি তাই তাকে বাধ্য হয়ে ভর্তি করতে হয় হসপিটালে। আর এই ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তোলে মি. রায়কে আর তদন্ত করার জন্য আমার কাছে পাঠান বাগচী বাবুকে, কি তাইতো ?'' মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেন মি. রায় ''যাক ঠিক দিকেই যাচ্ছি আর হ্যাঁ অবনীবাবু গৌরব সুস্থ আছে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর under-এ তার নার্সিংহোমে। আমি আন্দাজ করেছিলাম আর একদিন সময় নষ্ট করলেই হয়তো আপনি ওকেও কোনো ভাবে মেরে ফেলবেন তাই রিস্ক নিইনি। হ্যাঁ সুমিতা দেবী এবার আপনি বলুন তো কি দেখে মিসেস ঘোষ ভয় পেয়েছিলেন?'' বলে থামল দাদা। ''আপনি যখন সবই বললেন এটাও আপনিই বলুন'' মৃদু হেসে বললেন সুমিতা দেবী। ''তাহলে ভুল চুক হলে শুধরে দেবেন মি. এন্ড মিসেস বাগচী। মি. রায়ের কথায় আমার কাছে গেলেও অবনীবাবু কখনোই চাননি যে আমি তদন্ত করি তাই সেদিন সকালেই may be গৌরবের handicam-এ একটা AV রেকর্ড করেন তিনি তাতে কিভাবে সুব্রত বাবু গৌরব ও সৌরভকে হত্যা করা হয়েছে তা খুব ভয়ঙ্কর ভাবে বলেন এবং সৌরভ ও গৌরবের রক্তাক্ত ছবিও দেখানো হয়। আমার মামাতো ভাইটি সেদিন মিসেস ঘোষের ঘরের দেওয়ালে যে একটি বিশাল সাদা পর্দা দেখেছিল আমার বিশ্বাস ওই পর্দাতেই প্রজেক্টরের মাধ্যমে AVটা দেখানো হয়েছিল যাতে সেটা দেখে ভয়ে কষ্টে মিসেস ঘোষের আবার attack আসে। তাতে দুটো কাজ হবে আমাকে কিছু না বলেই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসা যাবে আর ডাঃ সেন-এর under-এ ওনাকে admit করিয়ে উইলে সই করিয়ে ওনাকে মেরেও ফেলা যাবে। কি তাইতো অবনীবাবু? আর আমরা হঠাৎ আপনার বাড়ি আসাতে আপনি তাড়াহুড়ো করে উপরে গিয়ে নাটকের প্রপ্স্ মানে আপনার প্রজেক্টর সরাতে চলে যান তাইতো ? কারণ ডাঃ সেন তো আপনাকে সেদিন ফোন করেননি'' মাথা নিচু করে হ্যাঁ বললেন তিনি ''কিন্তু পর্দাটা আর খুলে উঠতে পারেননি আর handicam-টা off করতে ভুলে গিয়েছিলেন শুধু।'' ''মি. ব্যানার্জী কিন্তু আপনি বুঝলেন কি করে যে অভিক এখানে আছে ? সেটাও কি সেন বলেছে ?'' আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করলেন মি. রায়। ''হা হা না না এটা আমারই ক্রেডিট বলতে পারেন। এর আগের দিন হঠাৎ যখন ওনার বাড়ি আসবো বলি উনি রাজি হন কিন্তু আসার সময় কারোকে একটা মেসেজ করে দেন সম্ভবত অভিককেই। আমি এই সামনের ashtray-টা তে সিগারেট ফেলতে গিয়ে দেখতে পাই আরেকটি সিগারেটের filter তখনও গরম, মানে কিছুক্ষণ আগেই কেউ ফেলেছে। তারপর সৌরভ বাবুর ঘরে গিয়ে দেখি তাঁর খাটের চাদর কুঁচকানো, কেউ নিশ্চয়ই গত রাতে শুয়েছিল। আর তারপর আর একটা জিনিস আমার ভাবনাকে সত্যি প্রমাণ করে দেয় তিনতলার সিঁড়িতে পায়ের ছাপ অথচ মি. বাগচী বলেছিলেন কেউ উপরে ওঠেনা। তাই আমি sure হয়ে যাই কেউ definitely থাকে ওই বাড়িতে, অভিকই সেটা sure ছিলাম না যদিও। আর এই নিন মি. রায় আপনার কোর্টে পেশ করার যথার্থ প্রমাণ। এটাই সেই AV যেখানে ইনি সব confess করেছেন। গতকাল সকালে ইনি আমার সাথে দেখা করার জন্য ছাপাখানার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পর এ বাড়িতে আমি আবার এসেছিলাম সৌরভের ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে এটা পাই। আর উপরি পাওনা হিসাবে দারোয়ানের কাছে জানতে পারি এখানে একজন পুলিশ থাকছেন কয়েকদিন ধরেই। যদিও বিভিন্ন ভেক ধরে অভিকবাবু আমাকে follow করেছেন ফোন করে হুমকিও দিয়েছেন কিন্তু অভিকবাবু এগুলো আর যার জন্যই হোক প্রজ্ঞান ব্যানার্জির জন্য যথেষ্ট নয়'' বলে হেসে উঠে দাঁড়ালো দাদা। এতক্ষণ অমোঘভাবে ঘটনাগুলো শুনতে শুনতে আমি বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম দাদার গাঁট্টায় জ্ঞান ফিরলো আর মনে মনে তাকে একটা সেলাম ঠুকলাম। পুলিশ সকলকে arrest করে নিয়ে বেরোচ্ছে মি. রায় বলছেন ''বুঝলেন মি. ব্যানার্জী একেই বলে মনে হয় perfect crime''। দাদা ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বললো ''ধন্যবাদ মিসেস ঘোষ আর গৌরবকে বাঁচাতে হেল্প করার জন্য।'' পুলিশ ডাঃ সেন, অভিক, মি. বাগচী আর সুমিতা দেবীকে গাড়িতে তোলার সময় দাদা পিছন থেকে চেঁচিয়ে বললো, ''উড়ো চিঠিটার জন্য ধন্যবাদ সুমিতা দেবী।''

মি. রায়ের সাথে করমর্দন করে আমরা গাড়িতে উঠলাম। উঠেই দাদা বললো, ''মাইমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতো আজ দুপুরে মেনু কি ?''

কাশফুলের গন্ধ

দেবকান্ত মাজী
চতুর্থ সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (সাম্মানিক)

"বুঝলি শেখর, তোরা যারা শহরে মানুষ তারা আর কাশফুল কই দেখলি সেভাবে?", বলতে বলতে আমার পাশে হাঁটছিলেন সুবীরদা, "আমরা আসলে ছোটো থেকে গ্রামে বড়ো হয়েছি তো, তাই জানি। শরৎ-এ বিলের ধারে সে কি শোভা! কি গন্ধ! আহা! এখনও চোখ বুজলে যেন সেই কাশফুলের মাথা দোলানো স্পষ্ট দেখতে পাই, বুঝলি তো! "

দুর্গাপুজোর প্রধান দিন আজ। মহাঅষ্টমীর ফুরফুরে শারদীয় আবহাওয়া। কিন্তু, এই বছরে আর তা অন্যান্য বারের মতো আনন্দময় নেই। বিশ্বব্যাপী মহামারীর সংক্রমণ, মানুষের অসহায়তা, মৃত্যুমিছিল — সবকিছু নিয়ে এবার 'মা' যেন এসেছেন অত্যন্ত মলিন সাজে। বিপন্ন মানুষদের করুণ আর্তনাদে চাপা পড়ে যাচ্ছে ঢাকের সেই হৃদয়-দোলানো শব্দটাও!

এই প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতেও আমরা প্রতিমা-দর্শনে বেরিয়েছি শুনলে অতি-সাবধানীরা হয়তো আমাদের ধিক্কারই দিতে পারেন। কিন্তু বলুন তো, পুজোর সময়ে আমাদের উৎসব অন্তঃপ্রাণ বাঙালি মনটি কি আর ঘরের চার দেওয়ালের বাঁধন মানতে চায়? বারবার মনে হয় অন্ততঃ কাছাকাছি হলেও দু-একটা মন্ডপে একটু ঘুরে আসি। সারা বছর ধরে জমে ওঠা দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতাগুলো পুজো মন্ডপে ঢুকলে, দুর্গতিনাশিনী দেবীর প্রসন্ন মুখখানি দেখলে — কোথায় যেন উবে যায়! তাই, আজ যথাসাধ্য সতর্কতা নিয়েই পায়ে পায়ে বেরিয়ে পড়েছি আমরা দু-জন।

"বাবু, একটা লেবু লজেন্সের প্যাকেট নেবেন? মাত্র দশ টাকা। খুব ভালো খেতে", হঠাৎ কথাটা শুনে পিছনে ঘুরলাম।

একজন মধ্যবয়সী মহিলা। শরীরের সহজাত জৌলুসে মালিন্যের ছাপ। কপালে সিঁদুরের টিপ। পিঠে একটি তথৈবচ জীর্ণ পাটের ব্যাগ। পাশে একটি বছর দশেকের বাচ্চা মেয়ে। ডাগর চোখে চেয়ে দেখছে আমাদের।

সুবীর দা ধমকে বললেন, "ধুর, এখন ভিড়ের মধ্যে এসেছে লজেন্স নিয়ে। যাও, এখন আমাদের ওসব লাগবে না! "

মহিলাটি করুণ স্বরে বললেন, "বাবু, লকডাউনের পর থেকে আমার স্বামীর আর কাজটা নেই গো। সংসার চালানো, মেয়ের লেখাপড়া সব সামলাতে আমাদের কাছে আর অন্য পথ নেই কিছু। নাও না দয়া করে। মাত্র তো দশটা টাকা। ভালো লাগবে খুব... "

সুবীরদা আরও কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে কিনে নিলাম তিনটে প্যাকেট।

টাকাটা নিয়ে খুব খুশি মনে বিদায় নিলেন সেই মহিলা। যাওয়ার আগে ক্ষণিকের জন্য লক্ষ্য করলাম, বাচ্চা মেয়েটির মুখে ফুটে উঠল সাময়িক কিন্তু স্নিগ্ধ এক প্রসন্নতার হাসি! যেন, বর্ষার ঘন কালো মেঘ কেটে গিয়ে শরতের এক চিলতে সোনালি আলো ছড়িয়ে পড়ছে ওর শুকনো মুখে। ঐ মায়া-জড়ানো হাসিটার দাম কি কখনও ত্রিশ টাকা হতে পারে?

আচ্ছা, সুবীরদা একটু আগে কাশফুলের কথা বলছিলেন না?

ওরা চলে যেতে আমি বললাম, "বুঝলেন সুবীরদা, আমিও কিন্তু এখন বুক ভরে বেশ পাচ্ছি সেই কাশফুলের মিঠে গন্ধটা! এই শহরের বুকেই। আর তা অনেক বেশি শারদীয়, অনেক বেশি আপন! কি আশ্চর্য, তাই না?"

সুবীরদা কী বুঝল, কে জানে! পিঠে চাপড় মেরে বলল, "চল্ তাড়াতাড়ি, মন্ডপে সন্ধিপুজোর ঢাক বাজতে শুরু করেছে। পুজোটা দেখে আসি, চল!"

করোনা সৃজন

সঙ্গম গায়েন
চতুর্থ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

দেবসভা। দেবতারা নৃত্যগীতে মগ্ন। এমন সময় দ্বারপালদের সুউচ্চ কণ্ঠস্বর, ''মৃত্যুজগতের অধিকর্তা যমরাজ বিশাল সংখ্যক জীবজগতের আত্মাদের নিয়ে দেবসভায় প্রবেশ করছেন।'' দেবরাজ ইন্দ্র সচকিত, সকল দেবতারাও স্তম্ভিত কারণ, কারণ যমরাজ কখনই দেবসভায় প্রবেশ করেন না। দেবরাজ যথারীতি যমরাজকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর আসার কারণ জানতে চান। যমরাজ বলেন, ''ইন্দ্রদেব, মর্ত্যলোকে মানুষ সমস্ত জীবজন্তুদের উপর বড়োই অত্যাচার করে চলেছে। তাই আমার সাথে এই আত্মারা এসেছে যাতে আপনি বজ্র প্রয়োগ করে এখনই মানুষের যথেচ্ছ ক্ষতি করেন।'' ইন্দ্রদেব গর্বিতভাবে বললেন, ''বর্তমান প্রযুক্তির যুগেও আপনি আমার উপর ভরসা রেখেছেন দেখে আমি খুবই প্রসন্ন। কিন্তু মানুষ যে বজ্রনিরোধক দ্বারা আমার বজ্রপ্রহার থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম। আমার দেবসভায় কোনো দেবতার পক্ষেই এখন মানুষকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়।'' আত্মারা চিৎকার করে উঠল, ''তাহলে উপায় কি?'' দেবরাজ চিন্তিত মুখে বললেন, ''উপায় এখন কেবল একটিই আছে, ত্রিদেব। অতীতে যুগের পর যুগ ধরে তাঁরাই বারংবার দেবতাগণকে নানা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আমাদের সকলের দৃঢ় বিশ্বাস, এই সমস্যার প্রতিকার ওনারাই করবেন।'' আত্মারা বলে উঠল, ''তাহলে এখনই আমরা সকলে বৈকুণ্ঠলোকে প্রস্থান করতে পারি না?'' দেবরাজ তাঁদের দিকে ফিরে বললেন, ''হে নিপীড়িত আত্মাগণ, এখন বৈকুণ্ঠলোক গমনের উপযুক্ত সময় নয়। আমরা আগামীকাল প্রাতঃকালেই ভগবান বিষ্ণুর কাছে আমাদের আর্জি জানাব। উনি দয়ানিধান। উনি নিশ্চয়ই আপনাদের উপর কৃপা করবেন।'' পরদিন সকালে সকল দেবতাগণ বৈকুণ্ঠলোকে প্রস্থান করলেন। বৈকুণ্ঠলোকে এসে তাঁরা দেখলেন, ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় শায়িত আছেন এবং তাঁর নাভিপদ্মে ভগবান ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন আছেন। তাঁরা উভয় দেব-এর কাছেই করজোড়ে প্রার্থনা করলেন, ''হে দেব, চক্ষু উন্মীলন করুন। মর্ত্যলোকের পশুপাখিগণ মানুষের অত্যাচার, নিপীড়নের জেরে বড়ই বিপদগ্রস্ত। এদের উপর কৃপা করুন প্রভু।'' ভগবান বিষ্ণু ও ভগবান ব্রহ্মা উভয়ই চক্ষু উন্মীলন করে বললেন, ''হে দেবতাগণ, আমরাও এখন আপনাদের মতোই অসহায়। একমাত্র কল্কি অবতারের জাগরণই এর প্রতিকারের একমাত্র উপায়। কিন্তু এখনও তার সময় হয়নি।'' দেবতাগণ করজোড়ে বলে উঠলেন, ''তাহলে এখন উপায় কি ?'' নারায়ণ বলে উঠলেন, ''আমি দেবাদিদেব ও দেবর্ষিকে এখানেই আহ্বান করছি।'' দেবাদিদেব এবং দেবর্ষি উভয়ই প্রকট হলেন। মহাদেব সমস্ত কিছু শুনে সঙ্গে সঙ্গে রক্তচক্ষু ধারণ করলেন। অবশেষে দেবর্ষি নারদ সকলকে আশার আলো দেখালেন। তিনি বললেন, ''হে ব্রহ্মদেব, মর্ত্যলোকে চীন দেশে এক বিশেষ অণুজীব সৃষ্টি করা হয়েছে। যতদূর শুনেছি এর সৃষ্টির কারণ ভারতের জনসংখ্যা হ্রাস।'' নারায়ণ তখনই স্মিত হেসে বললেন, ''হে ব্রহ্মদেব, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। হে পবনদেব, আপনি এখনই চীনদেশ থেকে সেই অণুজীবকে এখানেই নিয়ে আসুন।'' পবনদেব বলে উঠলেন, ''যথা আজ্ঞা প্রভু। আমি এখনই যাচ্ছি।'' পবনদেব কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুজীবটিকে নিয়ে বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হলেন। সকলে জয়জয়কার করতে লাগলেন। নারায়ণ বললেন, ''মানুষের তৈরি এই অনুজীব, যার নাম 'SARS COVID-19' virus এবার শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিন পবনদেব। মানুষ নিজেই নিজের কালকে সৃষ্টি করেছে। আমাদের তো এখন আর কোনও কাজই রইল না।'' সকল দেবতাগণ 'জয় ভগবান বিষ্ণুর জয়!' বলে জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। নারায়ণ বললেন, ''জয় বলুন দেবর্ষির। আজ ওনার জন্যই এই সমস্যা থেকে আমরা মুক্ত হলাম।'' সকল দেবতাগণ 'জয় দেবর্ষি নারদের জয়!' বলে জয়ধ্বনি করতে লাগলেন।

কয়েক মাস পর যখন সারা পৃথিবীতে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে, তখন পশুপাখিগণ আবার নতুন করে নিজেদের জীবনযাত্রা শুরু করল। আর নতুন এক শিক্ষাব্যবস্থা শুরু হল, 'Online Education'। তখন বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান বিষ্ণু দেবী লক্ষ্মীকে বললেন, ''দেখুন দেবী, মানুষ কত বুদ্ধিমান! এত বিপদের মধ্যেও নিজেদের জ্ঞানার্জনের উপায় ঠিক বের করে ফেলেছে। কেন যে মানুষ তার এই বুদ্ধিকে পৃথিবীর কল্যাণের কাজে লাগায় না ? আশা করা যায়, এরপর মানুষের শুভবুদ্ধির উন্মোচন হবে। তৈরি হবে এক নতুন জগৎ।''

প্রকৃত সরস্বতী

অন্বেষা সুলতানা
দ্বিতীয় সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

সেদিন টিউশান থেকে বাড়ি যাওয়ার পর থেকে সৌম্যর মনটা কেমন যেন খচখচ করতে লাগল। রাতেরবেলা মা তার পছন্দের খিচুড়ি বানিয়েছিল কিন্তু তাও পানসে ঠেকল মুখে। মনে হতে লাগল ওতো পড়াশোনার জন্য এত সুযোগসুবিধা পায় কিন্তু তাও যেন ঠিকভাবে পড়ায় মন দিতে পারে না। অথচ পাশের বস্তিতে থাকে সরস্বতী যে মনের আনন্দে পড়তে চায় কিন্তু সেই সুযোগটাই সে পায় না। আচ্ছা কিছু কী করা যায় না। ঠাম্মা বলতেন, ''যে মন দিয়ে পড়ে তার মাথার ওপর সবসময় মা সরস্বতীর হাত থাকে''। ''তা সে যে পরিবেশেই থাকুক না কেন ?'' ঠাম্মার কথা ভাবতে ভাবতে তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, একবার ঠাম্মা তার এক্সট্রা বর্ণপরিচয় বইটা শীতলা মাসির মেয়েকে দিয়ে দিয়েছিলেন। চকিতে মাথায় বুদ্ধিটা চলে এল। দুদিন পর তো সরস্বতী পুজো। এই দিনটাই কাজে লাগাতে হবে।

আজ সরস্বতী পুজো, সকাল থেকেই সৌম্যদের বাড়িতে তোড়জোড় চলছে পুজোর। পুরোহিত মশাই আসবেন সেই সাড়ে আটটার সময়। তাই আপাতত সৌম্যর মা আর কাকিমা পুজোর কাজ গুছিয়ে রাখছেন। কিন্তু কেউ খেয়াল করলেন না সৌম্য সকাল সকালই কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। পুজোর নির্ঘন্ট উপস্থিত, পুরোহিতমশাই এসে গেছেন কিন্তু সৌম্যর দেখা নেই, ফোনও ধরছে না। দেরী না করে পুজো যেই শুরু করতে যাবেন ওরা তখনই সৌম্য এল একটা বাচ্চা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। সৌম্যর বাবা বললেন, ''একী বাবু তুই কাকে এনেছিস, ওতো পাশের বস্তিতে থাকে''। সৌম্য বলে ''বাবা আমি তো পড়াশোনার জন্য এতো সুযোগসুবিধা পাই, তার কিছু উপকরণ যদি আমি সরস্বতীকে দিই তাতে কী ক্ষতি হবে বাবা ?'' ''ঠাম্মা তো সবসময় বলত যে পড়াশোনাকে ভালোবাসে তার বাড়িতে মা সরস্বতী সবসময় বিরাজমান'', ''তাই সত্যিকারের সরস্বতীকে বই, খাতা দিয়ে সাহায্য করলে কী ক্ষতি হবে বাবা ?'' এ কথার পর সৌম্যর বাবা আর কিছুই বললেন না সৌম্যকে। পুজো শুরু হল। পুরোহিতমশাই উদাত্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন –

''জয় জয় দেবী চরাচর সারে,
কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে
বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে
ভগবতী ভারতী দেবী নমোহস্তুতে।।''

'জগতের সব কিছু ক্ষণভঙ্গুর। শুধু একটা জিনিষ ভাঙে না, আর তা হল ভাব বা আদর্শ'

— *নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু*

উড়ান

সোমজিৎ দে
দ্বিতীয় সেমেস্টার, নৃতত্ত্ব বিভাগ (সাম্মানিক)

রাত তখন সাড়ে বারোটা। বৃষ্টি বাদলের রাত সেদিন, সামনের পুকুরের জল কানায় কানায় ভর্তি হয়ে এসেছে। উঠোনে জল ঢুকতে আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। ঘরটার ছাদ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে আর কোণে রাখা বালতিটাও ভরে এসেছে। এমনি একরাতে সত্যবাবুর বেজায় জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সামনে বসে আছে তার স্ত্রী অলোকা এবং সে খুবই ব্যস্ত। একবার স্বামীর মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে আরেকবার বাইরে বেরিয়ে একটা বিড়ালকে মেরে আসছে। কারণ, বিড়ালটা যত কাঁদছে অলোকার বুকের ধুক-পুকানি তত বাড়ছে। বাইরে এতই বৃষ্টির তান্ডবলীলা যার জন্য নীলু ডাক্তার ডেকে আনতে পারছে না। তাই সে চুপটি করে ঘরের চারটি কোণের একটি কোণে দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশের পাটাতন জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর হাঁ করে, চোখ বড় বড় করে বাবার কাঁপা শরীরটা দেখছে। নীলুর বয়স ছয় বছর। একটা হাসিখুশী, চনমনে ছেলে সারাদিন মাঠে-ঘাটে খেলে বেড়ায় আর খালি ভাবতে থাকে। যেমন – পুকুরে মাছ চললে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, আকাশে পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে, ছোটো-বড় যেকোনো বস্তু, জীব দেখলেই তাকিয়ে তাকিয়ে মন দিয়ে ভাবে। কিন্তু, কি ভাবে সে নিজেও জানে না। নীলুর বাবা সত্য দাস ছিলেন মুটে। সামনেই থাকা তাদের ছোট স্টেশনের মুটে। নীলু বাড়ির দরিদ্র অবস্থা কিছুই বুঝত না, তাই আপনভোলা হয়ে ঘুরে বেড়াত। সেই আপনভোলা ছেলেটির জীবনে যে ছাদটা চলে যাবে সে বুঝতে পারেনি। তাই সেই দুর্যোগের রাতে মায়ের হাউ হাউ কান্না দেখে মা-কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘‘মা মা তুমি কাঁদছো কেন ?’’ অলোকা মাটির মেঝেতে বসে সত্য বাবুর নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, ‘‘ওরে নীলু! তোর বাবা যে আমাদের ছেড়ে চলে গেল, এবার আমাদের কি হবে রে ?’’ এই কথাটার মানে নীলু বুঝতেই পারল না, শুধু বুঝেছিল মা কাঁদছে তাই মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে হবে ওর ছোট ছোট হাত দিয়ে।

এরপর সমাজের নিয়ম অনুসারে নীলুকে চুল কাটিয়ে ন্যাড়া করা ও নখ কাটানো হল। নীলু অবশ্য কেঁদেছিল কারণ সে ন্যাড়া হবে না। কিন্তু বাড়ির বয়ঃজেষ্ঠ্যদের ধমকে তাকে ন্যাড়া হতে হয়েছিল। বড়রা বলেছিল, ‘‘বাপ-মা মারা গেলে ন্যাড়া হতে হয়, তোর বাপ মরেছে তাই ন্যাড়া হতে হবে।’’ নীলু বুঝতে না পেরে বড়দেরকে দুটি প্রশ্ন করেছিল। এক, বাপ মরা মনে ? আর দুই, ন্যাড়া কেন হতে হয় ? এরমানে। এর উত্তরে বড়রা বলেছিল, ‘‘অতশত জানিনে বাপু! করতে হয় এইটুকু জানি।’’ এরপর যা যা কাজ ছিল সেগুলো মুখ বন্ধ করে নীলু করে নিল। কারণ, সে বুঝে গিয়েছিল যে কোনো কিছুর কারণ জানতে নেই, শুধুমাত্র সবাই করে বলে মুখ বন্ধ করে, করে যেতে হয়।

এরপর বেশ কয়েকটা দিন কেটে যায়, তখন অলোকা তিনটে বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে আর নীলু স্টেশনে মুটেগিরি করে। সব ভারি জিনিস বইতে পারে না। কিন্তু, কিছু জিনিস বইতে পারে। সকালের দিকে মুটেগিরি করে আর দুপুরে গ্রামের একটা ইস্কুলে পড়তে যায়। মা আর ছেলের রোজগারে ছেলের স্কুল আর সংসার কোনোরকমে চলে যায়। এখন নীলু অনেককিছু জানে। যেমন – পৃথিবীকে কিরম দেখতে হয় জানে, গঙ্গা নদী দৈর্ঘ্যে কতটা বড় জানে, মানুষের শরীরের ভিতরের অঙ্গগুলোর নাম জানে। এছাড়াও গাছের পাতার রং কেন সবুজ সেটাও জানে। বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম জানে। যেমন – সূর্য সেন, নেতাজী, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা, ভগৎ সিং ইত্যাদি। এইসবই জেনেছে কিছুটা ইস্কুল থেকে এবং কিছুটা ওর বন্ধু খোকন-এর বাবা-র থেকে। রোজ বিকালবেলা ইস্কুল থেকে ফেরার সময় ও খোকনদের বাড়ি যায় এবং ওর বাবার মুখ থেকে গল্প শোনে নিজেদের দেশের বা কোনদিনও বিদেশের বা কোনোদিন ইতিহাস, অন্যদিন ভূগোল, একদিন বিজ্ঞান, এছাড়াও আরো অনেককিছু। আসলে খোকনের বাবা একজন পত্রকার, একটি পত্রিকায় লেখালিখি করেন। তাই তাঁর অগাধ জ্ঞান। আর নীলুও খোকনের বাবাকে আদর্শ মনে করে। সে যতটা পারে মন দিয়ে খোকনের বাবার কথাগুলি শোনে ও বোঝার চেষ্টা করে।

দিনকে দিন নীলু যত জানতে থাকছিল, তার মনে থাকা প্রশ্নগুলি আর সমাজের মেনে চলা গোঁড়ামিগুলি পরিষ্কার হতে থাকছিল। হঠাৎই একদিন নীলু, খোকনের বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘‘কিভাবে আমি তোমার মত হব ? আর কেনই বা আমি এতকিছু জানব ?’’ এর উত্তরে খোকনের বাবা দুজন মনীষির বিখ্যাত বাণী নীলুকে বলেছিল। যথাক্রমে ডেল কার্নেগীর মতে, ‘‘অনুকরণ নয়, অনুসরণ নয়, নিজেকে খোঁজ, নিজেকে জানো, নিজের পথে চলো এবং জন আগাস্টাস শেড-এর মতে, ‘‘আগুন দিয়ে যেমন লোহা চেনা যায় তেমনই মেধা দিয়ে মানুষ চেনা যায়।’’ এই দুটি উত্তর যেন নীলুর চোখে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটাল।

এক পড়ন্ত বিকালে মনযোগসহ নীলু খোকনের বাড়িতে বসে একটা বই পড়ছিল, এমন সময় তার চোখ গেল টেবিলের উপর রাখা কয়েকটি খবরের কাগজের দিকে। তুলে নিয়ে দেখল একটা তীব্র, ক্ষিপ্ত,

বলশালী বাইসনের ছবি – নীচে লেখা আছে ''প্রায় ৩৬,০০০ বছর পূর্বে প্যালিওলিথিক যুগে স্পেনের আলতামিরার গুহা-তে গুহামানবের দ্বারা অঙ্কিত বাইসনের ছবি।'' নীলু প্রায় অনেকক্ষণ দেখতে লাগল ছবিটা। যত দেখছে তত অবাক হচ্ছে এবং মনে মনে ভাবছে যে এত বছর পূর্বে তো মানুষের জীবন যাপনে অনেক উথাল-পাথাল ছিল। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এত তুখর, অপূর্ব অঙ্কন প্রতিভা কি করে সম্ভব! সারারাত সে ভাবতে লাগল তারা বর্বর হয়েও যদি এত কিছু করতে পারে তাহলে সে তাদের থেকে আরও বেশী উন্নত মানব হতে কেন পারবে না! তাকেও পারতে হবে এবং সেও পারবে। সে তার দিনের বেলা দেখা স্বপ্নগুলোকে সত্যি করবেই করবে।

দেখতে দেখতে অনেকগুলি বছর কেটে গেছে, নীলু এখন যৌবনে পদার্পণ করেছে। তার সংসারে হাজার রকমের বাধাবিপত্তি, পিছুটান থাকা সত্ত্বেও সে জ্ঞান বাড়ানো থামায়নি এবং এমন একটা দিন এল যে দিনটায় সে জানতে পারল ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সে স্কুল তথা জেলা থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এর ফলে, হেড মাস্টারমশাই তাকে ডেকে বললেন, ''বাবা নীলু, তোমার এত অপূর্ব রেজাল্ট, তোমার এত মেধা, এত জ্ঞান নিয়ে তুমি বরং কলকাতায় পড়তে যাও, তোমার যাবতীয় খরচ স্কুল কর্তৃপক্ষ দেবে। তোমার অনেক উজ্জ্বল ভবিষ্যত বাবা। তুমি চলে যাও কলকাতা, সেখানে গিয় তোমার রেজাল্টের নম্বরের জোরে বড় কলেজ পেয়ে যাবে। কি বাবা নীলু যাবে তো? আরও জানবে তো ?'' নীলু শুধু হেডমাস্টারকে একটাই উত্তর দিল, ''স্যার আমি রাজি''। হেডমাস্টার বললেন, ''বেশ বাবা তাহলে তুমি, আর তোমার মা দুজনে ট্রেন ধরে কলকাতা চলে যাও। সেখানে সব ব্যবস্থা এবং দায়িত্ব আমার। Good Luck for your shining future'' নীলু সব শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্কুলের মাঠ টপকে, ধানক্ষেত টপকে দিগন্তের দিকে ছুটতে লাগল।

নীলুর জীবনের প্লেন অনেকদিন থেকেই রানওয়েতে গতি নিতে আরম্ভ করেছিল, এবার সেই প্লেন 'উড়ান' নিল।

'পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর
বিধির বিধান সত্য হোক'
— *কাজী নজরুল ইসলাম*

এক মায়ের গল্প

কৃষ্ণা ব্যানার্জী
অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ

সোনাবৌ, ও সোনাবৌ কখন থিকা ডাকতাসি কানে যায় না?

আসছি, আসছি ঠাম্মা, বলতে বলতে ঝিনুক লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল।

কি হয়েছে ঠাম্মা, ডাকছ কেন?

কখন থিকা ডাকতাসি, তর কানেই যায় না, এই বুড়িরে মানুষ মনে করস না।

ও ঠাম্মা, রাগ কোরো না, রান্নাঘরে ছিলাম, তোমার নাতিরা সন্ধ্যাবেলায় ফিরে কি খাবে তার একটু জোগাড় করছিলাম, শুনতে পাই নি গো, ঝিনুক জড়িয়ে ধরল ঠাম্মাকে মানে ওর শ্বশুরমশাইয়ের মাকে।

ঝিনুক তার এই ঠাম্মাকে খুব ভালবাসে, আশি বছরের বৃদ্ধার সাথে পঁচিশ বছর নাতবৌয়ের বড়ো মধুর সম্পর্ক। ঝিনুকের শ্বশুরবাড়িতে সবাই খুব ব্যস্ত। ওর বর, শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, সবাই নিজের নিজের কর্মজীবনে ব্যস্ত, তাছাড়া, তারা কম কথা বলে, সবাই একটু গম্ভীর প্রকৃতির। আর ঝিনুক এক মিনিটও মুখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। বাপের বাড়িতে সবাই তার বকবক শুনত, মা মাঝে মাঝে ধমক দিত অতিরিক্ত কথা বলার জন্য, কিন্তু তার জন্য ঝিনুক দমে যেত না। ঝিনুকের বাবা খুব গল্পবাজ, বাবার সাথে তার প্রচুর গল্প হত। দাদার সাথেও বেশ ভাব ছিল। বিয়ের পরে ঝিনুকের অবস্থা অনেকটা খাঁচায় বদ্ধ পাখির মত। ঝিনুকের বর আর্য হুঁ, হ্যাঁ তে কথা শেষ করে। দেওর ঋষি মজা করে বলে, এই শুরু হল বৌদির মেল ট্রেন চলা। এসবে ঝিনুক দমে যায়। দু বছরের মেয়ের সঙ্গে বকমবকম করে বটে, কিন্তু সে কি আর গল্প করা!! তাই এই ঠাম্মা এলে ঝিনুক বড়ো খুশি হয়, বেশ একজন গল্প করার লোক পায়।

ঝিনুক বলল, ঠাম্মা, ডাকছিলে কেন এবার তো বলো।

কমু না, যা ছেমরী, ডাইকলে সাড়া দ্যাস না, আর কমু না।

তাহলে চিৎকার করছিলে কেন? মায়ের ঘুম ভেঙে গেলে কি হত জানো?

ঝিনুকের শাশুড়ি মর্নিং স্কুলে পড়ান, দুপুরে ভাত খেয়ে বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নেন। এই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলে তার শরীর খারাপ হয়, মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায়। আর ঝিনুক ওর শাশুড়িকে বেশ ভয় পায়, ভয় যে লীলাময়ী মানে ঠাম্মা পান না, তা নয়। এখন মাথা গরম বলে এসব মনে পড়ছে না।

এসব কথায় তূর্ণা, ঝিনুকের মেয়ে উঠে মা আর বড়োমাকে দেখছিল। ঝিনুক এবার মেয়ে আর ঠাম্মার মাঝে শুয়ে তূর্ণাকে আবার ঘুম পাড়াতে পাড়াতে আস্তে আস্তে লীলাময়ীকে জিজ্ঞেস করে, ঠাম্মা, বলো, ডাকছিলে কেন?

পূজার আর কদিন বাকি ক তো? তোগো এই বাড়িতে পঞ্জিকাও নাই, তরা সব সাহেব হইয়া গ্যাছোস।

উফ, এত কথা বলো না তুমি ঠাম্মা, পূজোর এখনো মাসখানেক বাকি। তা পূজো কবে জেনে তোমার কি হবে? শুনেছি দাদু দুর্গাপুজোর পুরোহিত হতেন, তুমি তো আর হবে না।

না, ভাবসিলাম বাড়িতে যামু।

বাড়ি মানে লীলাময়ী যেখানে থাকেন, মালদহ। সেখানেই তিনি আর তাঁর বাকি পাঁচ ছেলে, মেয়ে থাকেন, ঝিনুকের শ্বশুরমশাই, বিমলানন্দ শুধু তাঁর পরিবার নিয়ে কলকাতায় থাকেন।

কেন, তোমার এখন বাড়িতে যাওয়ার কি হল?

আরে ছেমরী, হনুতে আমার আম, লিচু খাইয়া যাইতাসে, আর আমি এখানে তর পাশে বইয়া থাকুম!

ওঃ ঠাম্মা, তুমি পারোও বটে, ভাদ্র মাসও শেষ হতে চলল, এখনও হনুমান তোমার আম, লিচু খাচ্ছে!!! তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে, এবার পূজোয় আমাদের সঙ্গে থাকবে।

না রে, পূজায় তগো এই ইঁট, কাঠের শহরে আমি থাকতে পারুম না। জানস, আমাগো দ্যাশের বাড়িতে ক্যামন জাঁকজমক কইরা পূজা হইত। পঞ্চমীর দিন পেরতিমা আইত, আমরা বাড়ির বৌরা মাইয়ারা পূজার জোগাড় দিতাম, ভোগ হইত। আর জানস ঝিনুক, তর দাদু নিজে পূজা করত, পাঁচ দিন ধইরা উপাষ কইরা পূজা করত, কি সোন্দর সংস্কৃত মন্ত্র উইচ্চারণ কইরা পূজা করত, ধূপধুনার গন্ধে চাইর দিক ম ম করত। সারা গেরামের লোক ভোগ খাইবারে আইত। হিন্দু মোচলমান হগ্গলে আইত।

আচ্ছা, ঠাম্মা, মুসলমানরা কি একসাথে খেত?

না রে, ওগো আলাদা জায়গায় খাইতে দ্যায়ন হইত, তবে কি জানস, ভাব-ভালবাসার কোনো কমতি ছিল না। তর শ্বশুর হারাটা দিনভর মইনুদ্দিনের কান্ধে কইরা ঘুইরা বেড়াইত।

কিন্তু ভাবো ঠাম্মা, দেশ যখন ভাগ হল, তখন এই সম্পর্ক কেমন পাল্টে গেল, কত মারামারি, কাটাকাটি, কত রক্ত ঝরল বল তো?

শোন রে, মারামারি যা হইসে সব রাজনীতির খেলা, সাধারণ লোক এই সব চায় নাই, ঐ ন্যাতাদের উস্কানিতে সব ঘটসিল রে।

ঠাম্মা, তোমরা কি করে পালালে গো পূর্ববঙ্গ থেকে? বাবার কাছে কিছু শুনেছি, কিন্তু বাবা তখন ছোটো ছিলেন।

জানস ঝিনুক, আমাগো পলাইতে গ্রামের কয়জন মোচলমান সাহায্য করসিল, ঐ মইনুদ্দিন তর দাদুরে খবর দ্যায়, ঠাকুরমশাই, এইবার পলাইয়া যান, ওরাই গ্রামের বাইর আমাগো বাইর কইরা আনে। কিন্তু জানস তো কিস্যু আনতে পারি নাই আমরা।

এই দেশে এসে তোমরা কত কষ্ট করেছো ঠাম্মা, বাবা মাঝে মাঝে বলেন।

হেই দিনের কথা আর মনে আনতে চাই না রে। এ দ্যাশে আমাগো চেনাজানা তেমন কেউ ছিল না, যেখানে যাই, সেখানে তাড়া খাই, একটাই পরিচয় আমাগো তখন, রেফিউজি, তাড়া খাইতে খাইতে খাইতে তর দাদুরা চার ভাই ঐ মালদার পানে চইল্যা যায়। ঐ জমি তখন বাস করনের মত ছিল না, শ্যায়াল, বনবিড়াল তো ছিলই, সবথিকা ভয়ের ছিল সাপ, কত সাপ মারসি!! তর দাদুর বড় দাদার একডা মাইয়া, আমার একডা পোলা সাপের কামড়ে মারা যায়। বাচ্চা দুইডার জন্য একটু শোকও কইরতে পারি নাই। তরে আইজ একবার সইত্য কথা কই, আমি আর আমার জা ভাবসিলাম, দুইডা প্যাট কমসে, বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠল লীলাময়ী।

ঝিনুক ঠাম্মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কেঁদো না ঠাম্মা, তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের জন্য কত কষ্ট করেছ।

সে করসি রে, ঐ দ্যাশ থিকা আইয়া তর দাদু কেমন হইয়া গ্যালেন, একটু কুঁইড়া মানুষ তো ছ্যালেন, কিন্তু এই দ্যাশে আইসা লোকডা কাম করনের ইচ্ছাই হারাইয়া ফ্যালেন। জানস, তর দাদুর এই কুঁইড়া স্বভাবের জন্য ওর অন্য ভাইরা, তাগো বৌরা আমারে কি চোপা করত। কত হইসে, পুকুর থিকা কলমি শাক তুইল্যা তার সেদ্ধ কইরা তর কাকু, পিসিগো লবণ দিয়া খাওয়াইসি, আর জলটা আমি আর বেণু মানে তার শ্বশুর খাইসি। ভাতের ফ্যান গাইলা ফ্যানডা রাইখ্যা দিতাম, তর দাদুরে, পোলাপাইনরে ভাত দিয়া ফ্যানডা খাইতাম। প্যাট ভইরা আর কদিন খাইসি ক তো।

ঝিনুকের চোখ দিয়ে অবিরত জল গড়াচ্ছিল, ঠাম্মাকে আদর করে বলল, দেখো ঠাম্মা, তুমি কত কষ্ট করেছো, কিন্তু এখন তোমার ছেলে-মেয়েরা ভালো আছে, এটাই তোমার জয়।

না রে সোনাবৌ, এখন আর ভালো লাগে না, বড় কষ্ট হয়, তর দাদু মুখপোড়ার উপর রাগ হয় রে, আমার জন্য কিছু যদি রাইখ্যা যাইত তবে এই বয়সে আর পোলাগো হাততোলা হইয়া থাকতে হইত না। সে নিজে ডংডং কইরা চইল্যা গ্যালো, আমারে রাইখ্যা গ্যাসে এই জ্বালা সইতে। একবার উপরে যাই, দ্যাখ্যা হউক, মজা বুঝামু বুইড়ারে।

ঠাম্মার কথা শুনতে শুনতে ঝিনুকের চোখ মুখ হাসিতে চিকচিক করছিল।

আরে ছেমরি, দাঁত বাইর করস না। তরে একডা কথা কই সোনাবৌ, নিজের পায়ের তলায় মাটি শক্ত করনের চেষ্টা কর। তুই ল্যাখাপড়ায় ভালো, এবার চাকরিবাকরির চেষ্টা করিস। সংসারের কাম কইরা লাভ নাই রে, কুনো লাভ নাই।

ঝিনুক, চা করছ, শাশুড়ির ডাক শুনে ঝিনুক চলল রান্নাঘরের দিকে।

বুদ্ধদেব বর
ষষ্ঠ সেমেস্টার, নৃতত্ত্ব বিভাগ

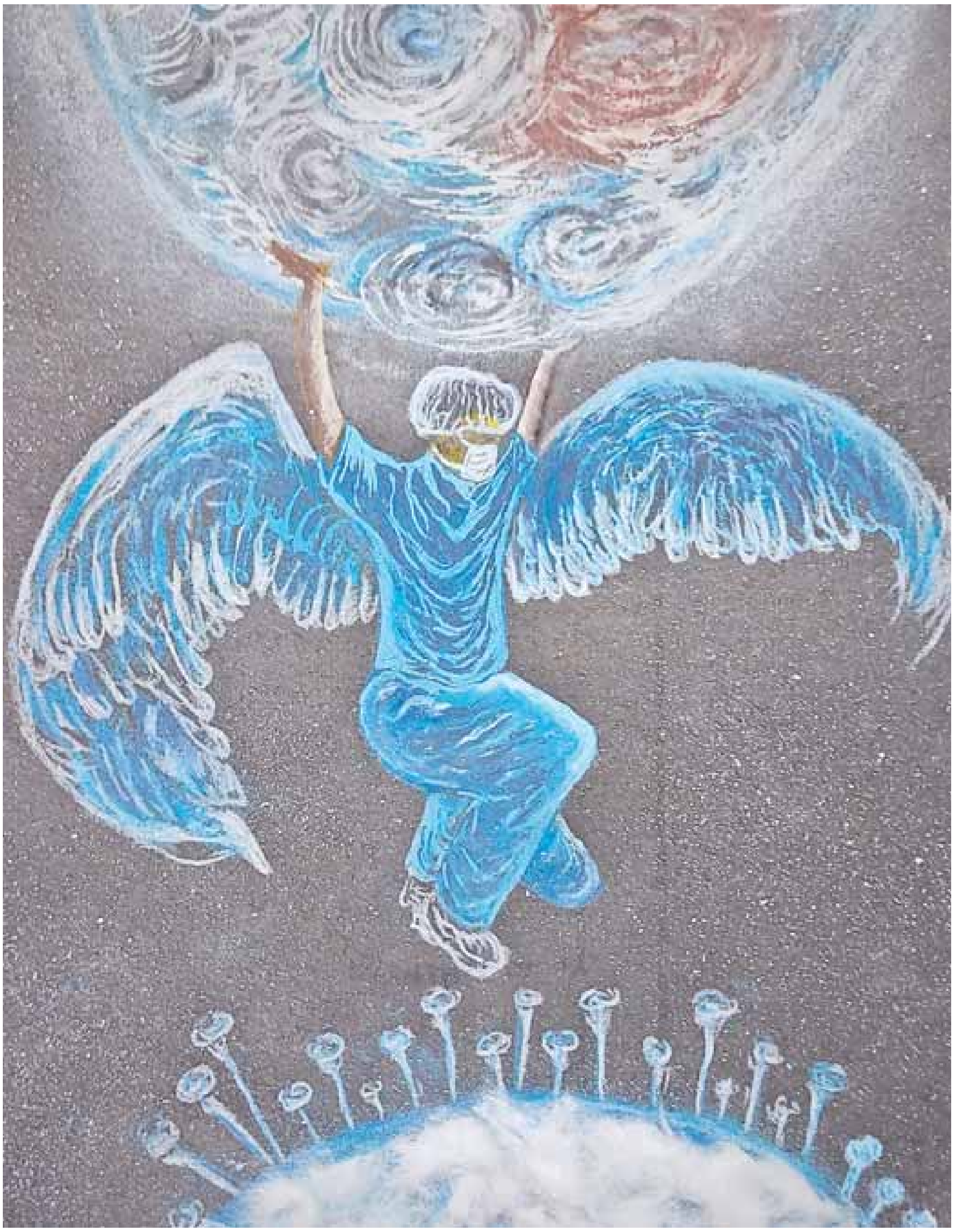

দেবারতি বেরা
ইংরেজি বিভাগ (সাম্মানিক)

দেবস্মিতা সাঁতরা
ষষ্ঠ সেমেস্টার, বায়ো সায়েন্স বিভাগ

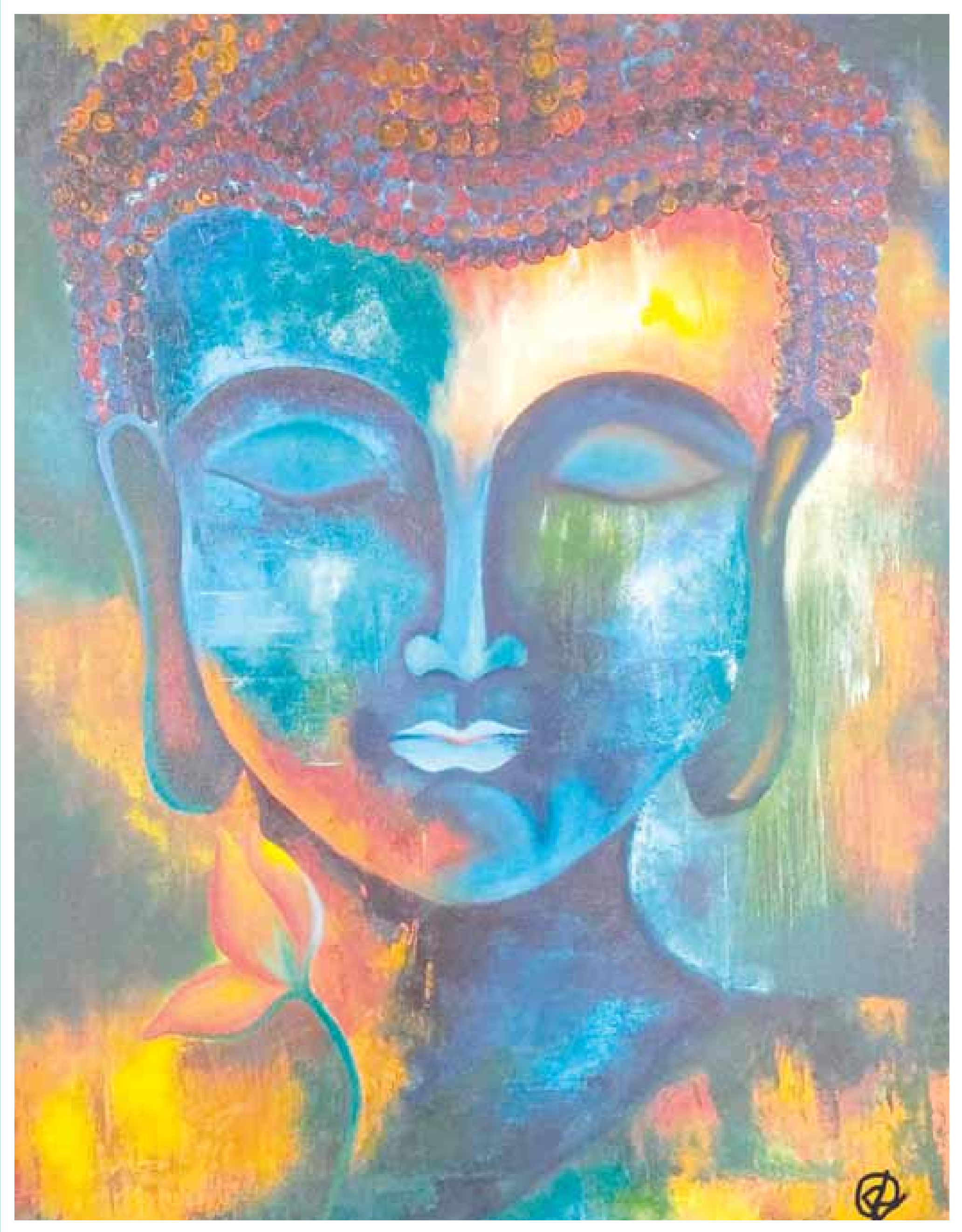

রিমা দাস
ইংরেজি বিভাগ

সায়ন্তনি চ্যাটার্জী
ইংরেজি বিভাগ

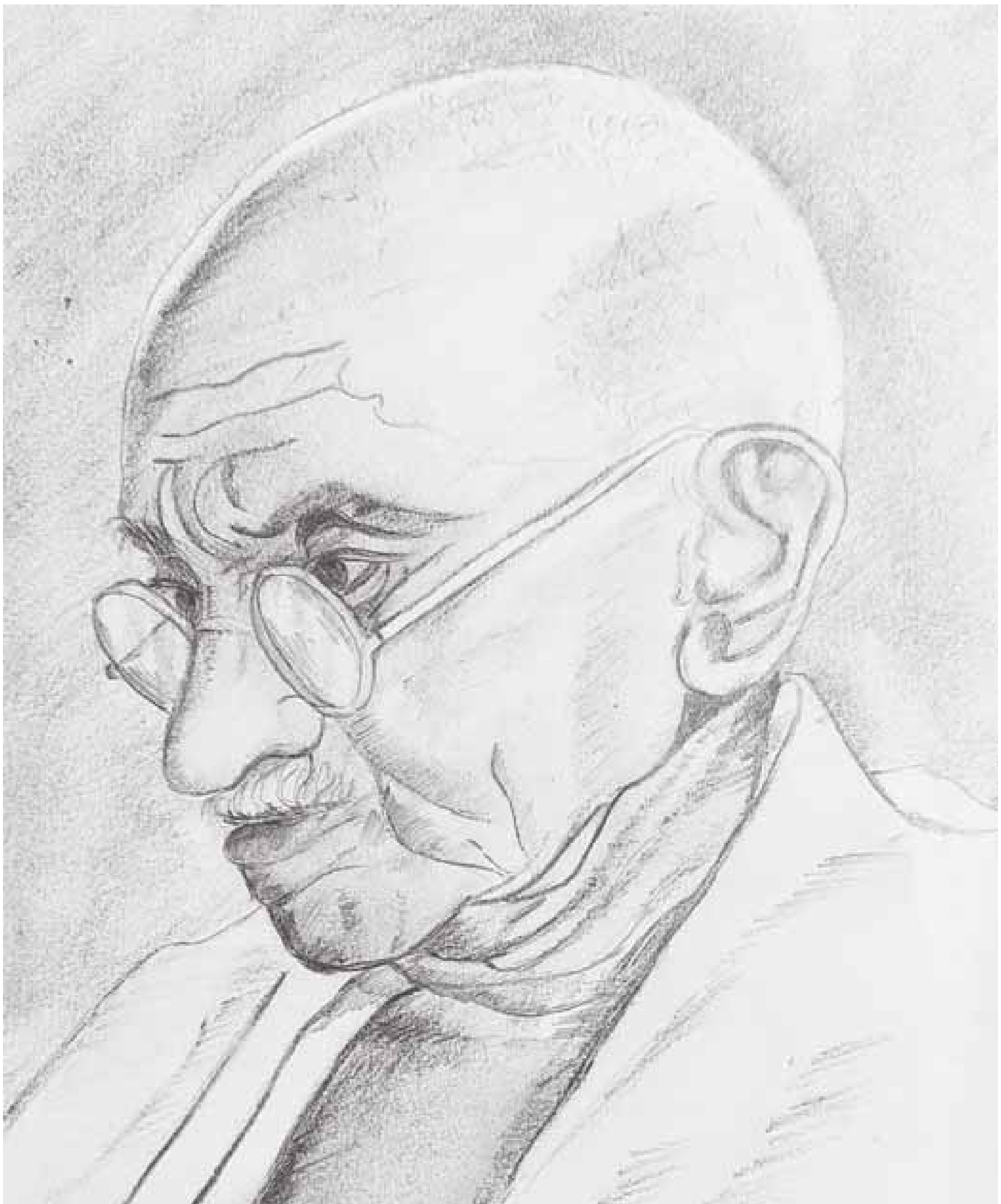

ফরিদা ইয়াসমিন

চতুর্থ সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ (সাম্মানিক)

শতাব্দী সরকার
দ্বিতীয় সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (সাম্মানিক)

সুস্মিতা সাহা
চতুর্থ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ (সাম্মানিক)

Sports and Personality

Soma Bank
Semester II, English (Honours)

Youth all through history has been a revolutionary force. Youth is that phase of life where dreams are built and a bright future forged. These are the years to foster moral principles, construct a value system and begin an all-new journey on the path of the 'right'. A nation's strength is in its youth. Youth can play a significant role in the development of the country not only economically, but also morally and practically. The youth in our country, as all over the world, is a great resource of the nation for development, innovation and social change. Thus, there is a need to harness youth power for nation-building by making them good citizens who are committed to society and nationhood. This can best be done by inculcating patriotism, providing good education, building character and generating employment.

Now let's come back to the main point 'How does sports develop the personality of a young person?' Playing in many ways is a silent revolution committed to the empowerment of youth and making an individual contribute towards nation building and security in substantial measure.

Playing sports can render a great helping hand towards social services and causes of national importance. Sports activity provides opportunities, to improve general knowledge, life skills, soft skills , communication skills, character building and traits of a well rounded personality. These basic leadership qualities and managerial skills will also prepare the young to rise as confident leaders and entrepreneurs.

The whole essence of sport lies can be perceived as an investment towards the youth of our nation. It harnesses the fountainhead of youthful energy through its aims and objectives. The objective development of character, comradeship, discipline, secular outlook, a spirit of adventure in every sportsperson lies at the core of sportsmanship.

Many social evils still prevail in modern Indian society that resist the forward march of our women . India is ranked 29th among 146 countries across the world on the basis of Gender Inequality index . Women empowerment has taken a boost from it.

Sports is human life in a microcosm . Apart from benefiting their physical health, sports also play an important role in psychological development and the social well-being of the young.

'Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever'
– Mahatma Gandhi

My Life will not be Worthless

Debanjana Banerjee
Semester VI, English (Honours)

If I can save one person from drowning,
If I can save one face from frowning,
My life will not be worthless.

If I find one little child to teach,
If I find one lost person to preach,
My life will not be worthless.

If I can drive away people's inner darkness,
If I can drive away their hidden starkness,
My life will not be worthless.

If I can help one bud to bloom,
If I can help one out through the gloom,
My life will not be worthless.

If I can save one innocent from crying,
If I can save one sufferer from dying,
My life will not be worthless.

If I can keep one pretty smile,
If I can keep pace with you for a while,
My life will not be worthless.

If I can make people's smiles limitless,
If I can make this world a better place,
My life will not be worthless.

Love

Sourav Ghosh
Semester VI, Anthropology

Love is great, experienced by everyone in life
Love is cool, it is everywhere
Love is beyond all, it is super powerful
The tenderness of it is the way anyone sees it
The intimacy of it can bring life to a still picture
The fondness of it can bring us all together
It ought to bring a great deal of warmth between –
the affection of Parents and their Children
There must be no external force which can break –
the powerful connection between them anytime
Even the indestructible energies and imperative obligations –

can't destroy the faith and value of it
The eminent job reminds us our duty to make our
Parents eternal by praying and assisting them at any age.

My starving Soul

Mithun Hazra
Office Attendant, Administrative

I am glad and promise my Soul;
Loyalty is born from a restless Soul.

My emptiness for this world as a whole;
Countless thoughts arise in the Soul.

Put my heart and Soul to my goal;
And be stiff as a mighty pole.

Egotism and depression may we bear;
These all will be one day war.

I want to see the real Star;
Fighting for the relevant war.

My Soul is athirst and starving;
Every blink of an eye is looking.

It's never unfaithful;
It's always beautiful.

I have a soul;
How to fill this empty Soul.

My fragmented Soul still prays for happiness;
But pain in soul, sometimes seems loneliness.

I am with her in every heart beat;
Each second counts, full of heat.

My feelings find invisible efforts;
Healing stands on her supports.

I write down a heartbreaking wave history;
Bond of the relationship sinks into mystery.

My mind is ceaseless due to neglect;
Dreams are shattered to be perfect.

I wish all would be glorifying;
Soul fills everything to pacify.

A Message To Death

Aditi Sarkar
Semester II, PG, English

Death,
You must be proud;
Taking so many lives at once,
Occupying all the areas of
The graveyard.

Death,
You must be ashamed;
For being so wicked,
For force keening millions of
Sons and daughters.

Death,
You must be heartless;
How you take the souls out
Of innocent bodies,
For your own delight.

Death,
You must be answerable,
To the life force;
To all the livings and those
Who are dead,
When will you stop?

Out of the Windowpane

Sayentani Chatterjee
Semester II, PG, English

Do you ever just sit there and observe the clouds drift away?
That's time drifting away.
Time packs its bag and departs, It never comes back.
Can you fathom something so precious being lost forever?
No trace. No warning.
Just forever slipping away like sand from the palm of life.
Isn't it so scary, so dismaying?
What I denominated as the present is now the past.

Do you ever look at the stars twinkling in the distant ashy blue sky?
And as the sky dusks and the night falls,
As the sky transforms its ombre to a solid dark blue
They shine even brighter.
They grow in number, slowly taking over the entire sky.
Then appears the white ball of light that illuminates the dark,
The moon with its blemishes but ever so beautiful.

And as I sit by the window in the faint luminescence of the Moon
I wonder what it's like to be so heavenly, yet so lonely.
I wonder what it's like to be able to outshine all other celestial bodies
But never be able to glow from within.
I wonder what it's like to be millions of miles away
Yet so close that you could almost see those scars.
Scars begotten by those who hurt her.
Be that as it may,
There she is standing out amongst all others,
Eclipsing their beauty, being admired by millions.

Life

Mahajabeen Anjum
Semester IV, English (Honours)

This is a gift from the Omnipotent
A precious and beautiful gift.
Make it beautiful and happy...
Because your life is priceless.
This is a journey between life to death...
Where you find many obstacles,
But you have to go on!

Life is a blank canvas
Fill it with colours of joy
Make every moment memorable.
Life is a tree filled with leaves
Some leaves fall and others don't
Life is like millions of stars in the sky
Sometimes sparks and sometimes dims…

Life has no definition... because it is unique
It is never the same for every living soul!
And when the journey ends
We all will claim a reward
And we find an everlasting peace
In the palace of God.

Being a Child

Madina Sultana
Semester II, PG, English

I miss being a child
you could dream
the biggest of dreams your mind could come up
with the most fascinating imaginations
but no one would say they are too wild
they would let you live in
a world that left you beguiled

I miss being a child
everyone you knew, everyone you didn't
everyone you met, everyone you wish you would've
were so pure and magnificent
just because you were a child

I miss being a child
when people's flaws were something you couldn't see
when your eyes only saw the beauty
when your eyes got teary
only because you wanted a candy

I miss being a child
when you grow up suddenly the world seems so cruel
you see the true colors of everyone and everything
when you grow up everything seems unkind
I miss being a child
when there were no forced smiles

I miss being a child
when you would enter a room full of people
their eyes would glimmer and so would yours
you loved the attention and everyone's awe

I miss being a child
when you grow up attention gives you anxiety
you're scared of people looking
their eyes are so demeaning

I miss being a child
when you looked into everyone's eyes
all you saw was love and empathy
the world seemed like a fantasy
but now as you've grown old
all you wish to filter what you see
like you could as a child
then they gave you comfort
now they make you want to hide

I miss being a child
because you were perfect
through the eyes of a child
the world seems worth it.

'An investment in knowledge pays the best interest'

– Benjamin Franklin

To Mom

Shumaila Maryam
Semester II, Zoology (Honours)

Dear mom…
I still remember
The sound of your last breath
I can still hear words that
You said just before your death
I can still feel your hands
Entangled warmly in mine
I can still envision your smile
Faint but still so fine
Although I do remember
The last promise I made to you
Stopping my flow of tears
I haven’t been able to
I miss you

When I was a teenager I always thought
That hanging out with you was so not cool
Sometimes I’d be embarrassed when you
Came to pick me up from school
I look back at those times and think
How silly I was to have refuted
The love of a mother, so caring
Whose sacrifices can never be disputed
Life has its own harsh way of teaching lessons
I guess it was meant to be this way
I am crying for your hugs now that you’re gone
Mom, I will miss you till my dying days

The grief is inexplicable
The loss feels unbearable
The bereavement seems never-ending
The lament seems to do nothing
The pain is strong and relentless
The hurt has rendered me helpless
The damage done is permanent
Your death was my life’s worst moment
I miss you mom.

While I was caught up trying to manage
All the wrong priorities in life
I overlooked how the nasty disease
Had taken over yours, causing endless strife
A false assurance, I used to give myself
That you were being cared for
Even visiting you in hospital
Sometimes I thought of it as a chore
But now that you are gone, I realize
How foolish I have been.
Mom, I am dying of guilt and regret
I hope you can forgive my sins
I miss you.

I wish I could turn back time
Not just by years, but decades
Right to the time I was a teenager
When you used to whine about my grades
I would do a lot of things differently
I would never have shown disrespect
I wouldn’t have tried to ignore you
I would have heeded your advice, so perfect
Mom, I know it is too late to say
All these things now
But I hope you are listening to all this
From the heavens above
I miss you.

Dear mom…
You don’t exist in this world anymore
But you always will, in my memory
You are not present in the house anymore
But in my heart, you will always be
Even though your existence
Is now personified by a gravestone
I know that if your love is with me
I will never feel alone
I miss you.

I can't cope up with the loss
It is too cruel for me to bear
So I am writing this poem
To lay my heart bare
My mom wasn't just my mother
She was my best friend
She was my guardian angel
Oh, why did this have to end
She was my real support
She was my heart's beat
Nothing and no one can be
Like her, so caring and so sweet
Her absence from my life
Has changed me as a person
Just like how a morning would be
Without the rays of the sun
I miss you.

You always fulfilled my wishes
Giving me whatever I wanted
Your presence in my life
I had taken for granted
After your death my whole world
Has gone into a frightening void
When I had you, I had it all
Now, everything is destroyed
This is my repentance, my regret
I know you can't hear me
But I still want to say
Mom, I miss you and I'm sorry

Does anyone feel my plight
Is anyone listening to me
Does anyone even care
My pain, can anyone see
I miss my mom, I really miss her
I can't stop the tears
I wish I could turn back time
By only a few years
To be cuddled by her again
To see her laugh and smile
To have her fuss over me
To make my life worthwhile
Mom, if you are listening
I want you to see how much
I am missing you
And your motherly touch

I leave the house every day
After looking at my mum's picture
That's not the same as getting
A real hug from her
Losing a mother is not easy
But many kids don't know this
Those who can experience her love
Live in pure bliss
Mom, even though since your death
It has been many years
Whenever I think if you
It still brings me to tears
I love you

You suffered the wrath of the disease
Day after day, you endured pain
You experience life's worst lows
You put up with trauma, again and again
But even while doing all this
You had a smile on your beautiful place
The heavens may have taken you away
But your spirit, nothing can erase
Even though you are not here
You live among us, even today
Mom, we feel your love's warmth
Through the sun's rays
We miss you.

Mom…
I still can't believe
That you are gone forever
Even if I have to believe
I will choose to, never
I can't believe how death
Can be so untimely
Coming to a person
Most undeservedly
I am sad because
I feel totally helpless
That death took away
The source of my happiness
I miss you

Dear mom…
I gather all my strength
I pool in all my might
I collect my composure
To pass day and night
I have to put in this much
Energy every single day
To convince myself
To live without you this way
I miss you.

Mom, for every time I have let you down
For every time I made you frown
I know it is too late for an apology
But as I silently weep, I want to say sorry
Like a fool, I never realized the value
Of having a loving mother like you
I know you wanted me to be my best
I realize you wanted me to outshine the rest
I promise to be the best person I can be
I promise to be the winner that you saw in me
It won't go in vain, it won't escape your eyes
I know you will be watching on me from the skies
I miss youI hate death not because

It eventually comes to everyone
But because it took away
My most favourite person
Amongst all the people that
I could never live without
It took away the most precious
And showed me its clout
I will always hate death
For making me motherless
Now every day of my life
Is spent in pain and distress
I miss you mom.

Mom…
I wish I could get
That one last hug again
I wish with you, I could
Talk away my pain
I wish I could meet you
If only for a little while
Just thinking about hearing
Your voice, makes me smile
I miss you

Dear mom…
The flow of your memories
Just doesn't cease
From your thoughts, I don't know
How to find a release
No matter where I go
Or whatever I do
In some way, I am
Always reminded of you
I wish that there was a way
For you to magically appear
I would give anything to have
You beside me, right here
I miss you mom love you forever.

The Blank Space

Archan Dasgupta
Semester II, PG, English

Rana gently opens his eyes and finds himself lying in an open field wearing a white tussar overall, he slowly sits up and takes a look at himself, his ebon skin beneath the glaze of the dress makes him strangely uncomfortable. In his entire lifetime he has never had the opportunity to garb such elegant clothing. He lifts his palms up, twists and turns them slowly in an attempt to figure out what has happened. It isn't what he had imagined it to be, the place definitely does not resonate any of the descriptions his mother told him during his childhood. Neither is it like the books he had once read.

"Is someone here? Where am I? What is this place?" Rana shouted.

Rana cautiously starts to look all around him, with a be wildering indication on his face and anxiety on his eyes. Suddenly, his eyes fall on a distant, big, brown, wooden door, standing on the east side of the field, enveloped in a thin veil of fog. As he nears it, he discovers beautiful carvings chiselled all over it. He slowly picks his hands in a lingering fear from the trance of the unknown and gives the door one mighty push. The door wide opens with no sound as if its hinges have been newly oiled. Much to his surprise, Rana finds that the door has brought him to the cement slabs beneath the banyan tree of his neighbourhoods' juncture where he seldom used to wait for Aadita. He looks around but is unable to spot anyone, as if everyone that ever lived there has abandoned the place to be a ghost town. Everything that he could possibly remember about the place is present except for the people who resided there. His wandering eyes frantically searching for its inhabitants reaches the corner of the alley, he runs there and tries to spot his house but cannot, because of the dark sky. The certain ambience of gloom that has pervaded into every object around Rana was very new to him, he cannot imagine that his *para* ever looked like this, it usually was a jovial place to be at. Helooks up to the heap of dark cotton-like clouds textured by its occasional yellowish stream of lights and murmurs to himself, "it's going to rain as it seems" with a pause, "just like..." his mind immediately flows back to a distinct memory, but before his thought process could reach its completionit is suddenly interrupted by a frail Rabindra Sangeet which can be heard from a distance. Rana frowns a little, "that's an unusual!" says in a low tone and ambles tracing the songs' direction. Usually, radio cacophonies of retro Bollywood or Tollywood songs could be heard there, so, naturally, Rana's curiosity compelled him to check its source. He walked a little, just behind the banyan tree and cemented slabs and he could listen the song even better now. The strain has started to become clearer to him, he could even manage to figure out a word or two of the song. Rana now stops a little, a sudden ripple of fright has taken over him, but his curiosity to discover someone quickly takes over all of his senses and he slowly starts to move again. He takes a turn and comes across a well-furnished sitting roomwith a sinuously designed carpet laid at the centre and a small wooden side-table holding up a gramophone. He realises it is the gramophone which issinging the melodyfromthe left side of the room. On the other end of the room is an ergonomically curved and padded rocking chair with a footrest and a middle-aged woman residing on it with her right handrested on the armrest and left hand holding a newspaper.With one foot on the footrest,she is humming to the song with her eyes closed and her grey head laid back. Rana's sense of fear has somehow been replaced by a sense of relief. He has found someone; he has found somebody. Beside the woman is a golden lamp, very bleak but enough to inform the woman of Rana's presence in the otherwise dark room. She opens her eyes slowly, tilts her head a little and takes a look at Rana. As soon as their eyes meet, a chill goes down Rana's spine and his eyes turn big.

"Yo..u!" he exclaims in a trembling voice, "How are you here?" he continues.

Having completely figured out who Rana was, squeezing her eyes the lady replied, "aren't you…aren't you that boy who came to me that night?"

Rana's voice chokes up, droplets of sweat has started to appear on his forehead, "no it's not happening, it's not possible, how could it be?" he managed to utter in

a dry throat. Sensing Rana's panic, "Oh sit sit, everything is possible here, sit!" replied the ladywhile gesturing him to sit down.

Rana slowly sits down in the carpet, clicks his tongue and asks, "How are you here? How are you here in my *para?*"

"Your *para*?" said the woman with a giggle., "Look around boy it's my room, how come is it your *para*"

"But I just came from..." before Rana could finish

"Yeah I get it. You liked your *para,* didn't you?"

Still surprised, Rana replies in a very low voice "yeah!itwas nice"

"just nice? No no if it were just nice, you wouldn't have been there now. You liked it, it was your happy place" she replied in a low voice too.

"It might have been" said Rana less attentively, with his head down, "but how are you here? It makes no sense".

She giggled again and replied, "I am in my happy place boy!"

"NO! here, here how are you here, in this place"

"Where am I supposed to be then?"

"I don't know, not with me for sure, we don't belong in the same place" screamed Rana "Why? Where do I belong?"

"Somewhere up there" Rana looks up to point at the sky but it is not there anymore. All he could see is a false wooden ceiling and a fan attached to it, which is barely moving. He quickly turns his surprised eyes towards her to express his concern, but she says,

"No we are altogether in this!"

"But!" replied Rana in a very low and confusing tone

"But what?"

"But we don't belong together, I don't belong with you, there's been a mistake" Rana continues to mutter.

"Now I wouldn't question that!" she says while turning towards her newspaper. She then slowly lifts her head towards her gramophone and says, "but can I question you something?" Rana's sense of fear has starts to ignite again, with his heart beating really fast Rana replies in a very meek voice, "I know what you'll ask".

"You do?"

"Yes!"

"Then can you answer?"

Rana pauses a little and begins to answer, "I-uh, I needed the money, I needed it Ma was ill they were making bills I couldn't even count with how many zeroes, I needed as much money as possible"

"That's not my answer, you could have just taken the money and left, what harm did I do?"

"I don't know, I never did anything like this in my life, I was scared" Rana continued in the same breath, "You turned to the other side and I thought you were awake so I…" Rana stopped panting for breath, "...I had to…" before Rana could finish his sentence he closed his eyes and immediately covered his face with his hands,his lips started to tremble and he burst out in tears with a loud wail.

"Oh stop-stop" the womangot up from the chair supporting her knees and came running towards Rana, she sat down grasping her knees again, placed the paper from her hand onto the carpet and gently brushed her hand at Rana's back, "stop boy, don't cry!" "I should not have done it, I should not have done it" Rana continued while tears kept rolling down his cheeks.

She slowly put her arms around Rana and said, "I know boy, sometimes we do the grimmest of things when cornered, and worst of all, we tend to justify it, but you repent and that is all what matters boy. I have seen you cry in that cell, and that is already way more tears than anyone has shredded for me, so don't cry, don't cry!"

Rana slowly lifts his head up, his cheeks still shining and eyes still banking tears at its verge, "You saw me?"

"Yes…Rana. I did".

Rana stays silent for a while and says, "was it very painful?" She exhales a breath and says, "For a moment, yes! But then I couldn't feel a thing" by gently nodding her head.

Rana couldn't utter a single word, he sat there like a statue, snivelling and thinking of the heinous task he had done. Breaking Rana's silence the woman said, "You come to your happy place Rana, once you are done with the world, that is how I am in your *para*, and you in mine!

Rana's eyes still wet, he said, "but…"Rana started to sob again.

She asked in a very slow voice, "Why is this your happy place Rana?"

With his voice shaking, Rana whimpers, "I met her there, below that Banyan tree everyday while she returned from her night shift at the hospital."

"Who?"

"Aadita"

"Who is she?"

"We were supposed to marry next winter" he replied and broke down into a squall. She lowered her head and patted Rana in an attempt to console although she quiet knew she didn't have a word to say to him. As the mellow song, 'ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে, / হল কানায় কানায় কানাকানি এইপারে ওইপারে' filled the silence of the room, only the flapping of the month-old, folded newspaperlying on the carpet, could be heard.

After a while, Rana wiped his tears, rubbed his nose momentarily and pursed his lips while exhaling a breath. He then turned his eyes to read the headline, '*Burglar Accused of Stabbing and Robbing Elderly, Commits Suicide in Mahanagar Jail*' on the newspaper. With a heavy voice from all the crying and eyes fixated on the paper, Rana asked, "Did you leave some unfinished business behind?". She gradually lifted her head, the glistening in the corner of her eyes could clearly be seen, her face; still,she looked straight at Rana's face and replied, "I left a few *bori* to dry on the terrace, but never got the chance to pick them up, wonder what happened to those".

'Education is simply the soul of a society as it passes from one generation to another'

– G.K. Chesterton